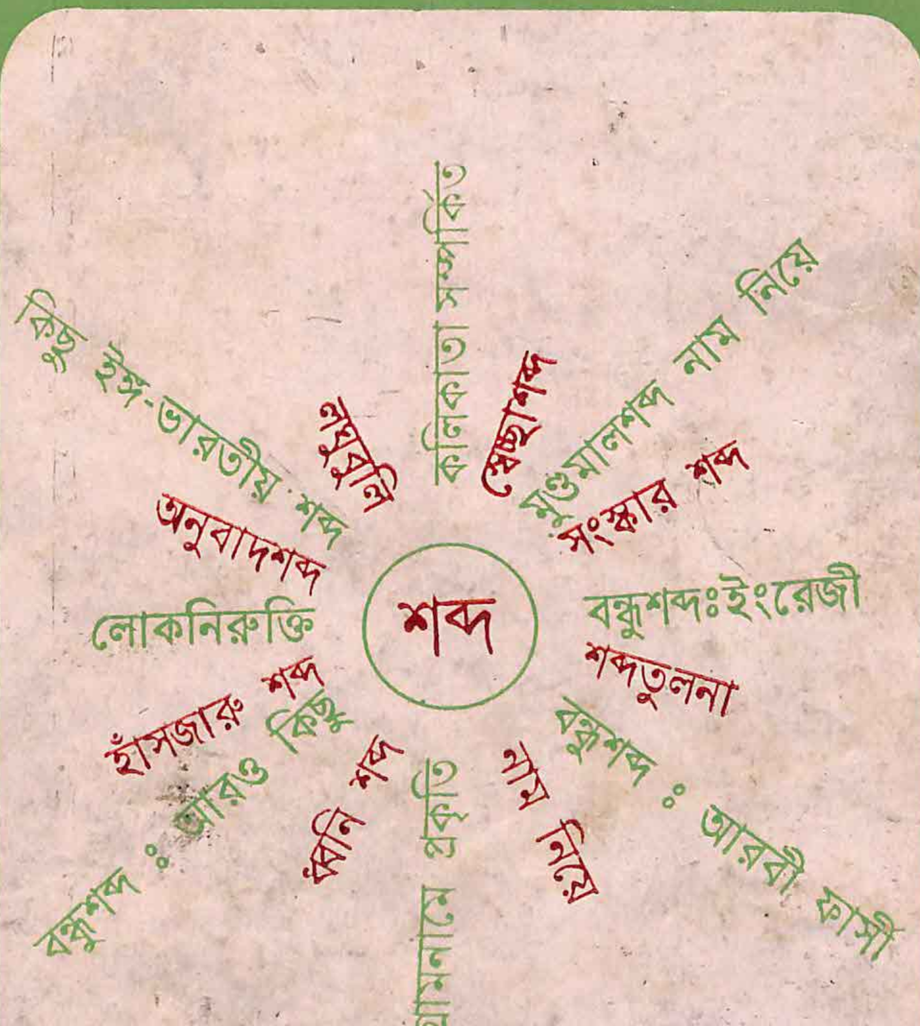
শব্দ যখন গল্প বলে

জ্যোতিভূষণ চাকী



Apprd for ISES
DAS 29/7/91

শব্দ
যখন
গল্প
বলে

শব্দ যখন গল্প বলে

জ্যোতিভূষণ চাকী

বেস্টবুক্‌স্
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা – ৭০০ ০০৯

Sabda Yakhan Galpa Bale.
(Story behind words)
By Jyotibhushan Chaki

প্রথম প্রকাশ – ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৯১

ISBN : 81-85252-27-0.

প্রকাশন ঃ
বেস্ট বুক্‌স্
প্রকাশন বিভাগ
১এ, কলেজ রো, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

লেজার সেটিং ঃ
ওয়েলকম এ্যাসোসিয়েট্‌স্
৭৮/বি, মনসাতলা লেন, কলিকাতা - ৭০০ c

মুল্য ঃ ঃ পঁচিশ টাকা (২৫-০০)

কিশোর-কিশোরীদের হাতে

মুখোমুখি

শব্দ নিয়ে লেখার তাগিদ প্রথমে পেয়েছিলাম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। নব পর্যায়ে 'সন্দেশ' বেরনোর সময়। 'কী করে এল' নামে ধারাবাহিকভাবে কিছু শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সন্দেশে। তারপর 'শব্দের পিছনে' নামে একটি বিভাগে এ ধরনের লেখা লিখতে হয়েছিল কিশোর পত্রিকা 'ফুলকি'র জন্যে। ছোটোদের পাক্ষিক সংবাদপত্র 'ক্ষুদে সাংবাদিক' কাগজেও 'শব্দজিজ্ঞাসা' নামে ধারাবাহিকভাবে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। একই সঙ্গে Children's Book Trust প্রকাশিত Children's World পত্রিকাতেও শব্দ নিয়ে কিছু লিখেছিলাম। সে সময়ে খুবই উৎসাহিত হয়েছিলাম ছোটোদের কাছ থেকে চিঠি পত্র পেয়ে। তারা জানতে চাইত বহু শব্দের জন্মকথা, শব্দসম্বন্ধে নানা তথ্য। ছোটোদের এই জিজ্ঞাসাই ছিল এ কাজের প্রেরণা। তারপর যা হয়, তাই হল, নানা কারণে ভাটা পড়ল এ কাজে। সম্প্রতি হঠাৎ একদিন আমার প্রিয় প্রাক্তন ছাত্র রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায় এসে বলল, 'স্যার, শব্দ নিয়ে একটা বই করুন। এ নিয়ে তো অনেক লিখেছেন আগে। একসঙ্গে করলেই তো বই হয়ে যাবে। আমরা ছাপব। রাতুলের দিকে তাকালাম, রাতুল যখন লেখাগুলো পড়েছিল তখন সে ছিল ছোট্ট, আজ বেশ ভারিক্কি তরুণ – স্বচ্ছন্দে বলতে পারে, 'আমরা ছাপব'। কত বড়ো কথা। বই লেখার নিমন্ত্রণে তো মনে জলতরঙ্গ বেজে উঠল, কিন্তু হরিষে বিষাদ ঃ লেখাগুলো তো প্রায় কিছুই নেই সঞ্চয়ে। রাতুল অম্লানবদনে বলল, 'লিখে ফেলুন নতুন করে, বেশি সময় লাগবে না আপনার। বেশি সময় আপনাকে দেবও না আমি।' বললাম 'তথাস্তু'। সময়ের ব্যাপারে রাতুল বড্ড কড়া। তাগিদ আর তাগিদ, আর তার ফলে এই বইটি।

শুধু এইটুকু বলি তোমাদের। আগেকার অনেক ধারণা বদলাতে হয়েছে, পরে হয়তো আরও বদলাতে হবে, ভাষা তো বদলে বদলেই চলে।

এই বই পড়ে তোমাদের মনে যদি শব্দের ব্যাপারে কোনো কৌতুক বা কৌতূহল জাগে আর এ বইটাকে বিচ্ছিরি ভেবে যদি আরো নতুন নতুন বই লিখতে ইচ্ছে হয়, তাহলে দারুণ খুশি হব।

২৮-১২-৯০

কেউটে

জলঢোঁড়াকে 'কেউটে' বলে। কথাটা 'কৈবর্ত' থেকে এসেছে বলে মনে হয়। জলে থাকা আর মাছ ধরে খাওয়া এই সাপের স্বভাব বলে কৈবর্ত—সাদৃশ্যে এ সাপ এই নাম পেয়ে থাকতে পারে। কৈবর্ত মানে জেলে। 'কৈবর্ত' থেকে 'কেউট'। 'কেওট এর মতো' এই অর্থে কেওট+ইয়া = কেউটিয়া, তার থেকে কেউটে।

খিচুড়ি, খিচুরি

চালে ডালে মেশানো সিদ্ধ ব্যঞ্জনবিশেষের নাম খিচুড়ি। শব্দটির মূল সংস্কৃত 'কৃসর' শব্দ। সুশ্রুতসংহিতায় কৃশর বা কৃসর তিল ও মুগ মিশ্রিত অন্ন বোঝাতে ব্যবহার হয়েছে।

গোরু

মূল শব্দ 'গো', তার সঙ্গে একই অর্থে 'রূপপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। গোরূপ > গোরুঅ > গোরু।

ঘড়ি

একসময়ে সময় নিরূপণে ব্যবহার হত জলভরা ছোটো ঘট বা ঘটি। ঘটিতে ছিদ্র থাকত, ঘটির জল নিষ্কাশনের সময় দেখে সময় মাপা হত। এই 'ঘটি' থেকেই 'ঘড়ি'।

ডেঁপো

'ডেঁপ' এসেছে 'ডিম্ব' থেকে। 'ডেঁপ' বোঝায় অঙ্কুর গজানো। ডেঁপ+উয়া > ও = ডেঁপো। 'ডেঁপো' বোঝায় অঙ্কুরোদ্গমের অবস্থা। আলংকারিক অর্থ দাঁড়ালো অঙ্কুরোদ্গমের অবস্থাতেই পরিণত বৃক্ষের অবস্থার অনুকরণ। তাই অল্পবয়সে যে বয়স্কের মতো কথা বলে বা আচরণ করে তাকে আমরা বলি 'ডেঁপো'।

ছিঁচকে

হুঁকা ইত্যাদির নলচে সাফ করার জন্যে লোহার তৈরি যে ছোটো শিক লাগে তাকে বলে ছিঁচকা বা ছিঁচকে। শিক+চা (ক্ষুদ্রার্থে), চে = শিকচা বা শিকচে, এর থেকে কথাটা দাঁড়ালে ছিকচে, এর পর বর্ণবিপর্যয়ে হল ছিচকে বা ছিঁচকে।

ছিঁচকে চোর বলতে তাই বোঝায় ছোটোরকমের চোর বা পাতিচোর। অর্থাৎ হাতে তার বড়ো সিঁধকাঠি নেই, আছে নল্‌চে পরিষ্কার করার ছিঁচকে।

জম্পতি

'দম্পতি' শব্দ দ্রষ্টব্য

জুতো

'যুক্তক' থেকে 'জুত্তঅ', তার থেকে জুতো। কথাটার মূল অর্থ জোড়া বা pair। মনে হয় পাদুকাযুক্তম্ (অর্থাৎ পাদুকাজোড়া) শব্দ থেকে 'পাদুকা' বাদ দিয়ে শুধু 'যুক্তক' ব্যবহার হত। তার থেকেই জুতো।

তামাক

Sir Walter Raleigh আমেরিকায় ভার্জিনিয়া থেকে আদিম অধিবাসী রেড্ ইণ্ডিয়ানদের তিনটি জিনিস আনেন ইংলণ্ডে – Tobacco, Tomato ও Patato। এইবার Tobacco ইউরোপ সফরে বেরলো। জার্মানিতে গিয়ে তা হল Tabak ফ্রান্সে Tabac (তাবা), রাশিয়ায় Tabaku (তাবাকু), চীনে তাম্বাকু। এই চীনা তাম্বাকুই বাংলায় হল তামাকু বা তামাক। পণ্ডিতেরা এই ওপারের জিনিসটাকে শুদ্ধ করে নিলেন 'তাম্রকূট' নাম দিয়ে। এজন্য স্পষ্ট করে বলা উচিত, তাম্রকূট থেকে তামাক আসে নি। 'তামাকই' হয়ে উঠেছে তাম্রকূট। ধোঁয়ায় গোঁফদাড়ি একটু তামাটে হয়ে ওঠে বই কি ?

দম্পতি

জায়া ও পতি = দম্পতি। 'জায়া' শব্দের জায়গায় যে 'দম্' হয়েছে তা লাতিন শব্দ (তুলনীয় : domestic)। গৃহ বা গৃহিণী এক বলে ধরে নেওয়া হত – গৃহিণী গৃহম্ উচ্যতে। তাই গৃহিণী নামক শব্দের জায়গায় গৃহবাচক শব্দ। সমার্থক 'জম্পতি' শব্দের 'জম্' এসেছে গৃহবাচক সংস্কৃত শব্দ 'জ্মন্' থেকে।

দ্বিরেফ

ভ্রমর বা মৌমাছির নাম 'দ্বিরেফ'। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ৭-৮ বছর তখনকার লেখা একটি কবিতায় তিনি ভ্রমরের বদলে দ্বিরেফ শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। নবগোপাল বাবু শুনে হেসেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছিল ঐ শব্দটির প্রতিই সব আশাভরসা। রবীন্দ্রনাথ বললেন– 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল নবগোপাল বাবু সমজদার লোক নহেন' থাক সে-সব কথা। ভ্রমরের নাম দ্বিরেফ কেন সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। 'ভ্রমর' কথাটা ভাঙলে কী দাঁড়ায় ? ভ্ র্ অ ম্ অ র্ অ। কটা 'র' আছে ? দুটো। 'র'-এর সংস্কৃত নাম 'রেফ'। 'ভ্রমর' শব্দে দুইটি 'রেফ' বা 'র' আছে বলে ভ্রমর পেয়েছে ঐ নাম।

সূচী

যে গল্পের শেষ নেই

সেই আদিকালে মানুষ যখন মুখ ফুটে মনের কথা বলতে পারত না, তখনও সে মনের কথা জানিয়েছে, জানাবার উপায় উদ্ভাবন করেছে। লতায় গিট বেঁধে, লাঠিতে দাগ কেটে, সুতোর নক্সা বানিয়ে, ছবির পর ছবি এঁকে কত ভাবেই না মানুষ সেতুবন্ধন করেছে মানুষে মানুষে। আভাসে ইঙ্গিতেও কত কথা বলেছে সে।

তারপর এল সেই রোমাঞ্চকর দিন, মানুষ কথা কয়ে উঠল। মানুষের ইতিহাসে অমন সোনালি দিন আর হয় না। সভ্যতা এগিয়ে চলল কথার মালা গেঁথে গেঁথে। একেকটা শব্দ যেন একেকটি ফুল।

ঋগ্‌বেদের ঋষি গাইলেন 'শব্দগুলো আমাদের কাছে আসে তাদের রূপলাবণ্য নিয়ে। আমরা তা তেমন তাকিয়েও দেখিনা, শুনেও শুনি না কান দিয়ে।' সত্যি তাই। আলো হাওয়া-জলের মতো যা সহজ তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দেওয়াই হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু যদি দিই তাহলে বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না।

বহু মানুষ আর বহু ভাষায় এই পৃথিবী। সব ভাষাতেই আছে মাধুর্য আর বৈশিষ্ট্য, কিন্তু 'বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা ?' আমাদের বাংলা ভাষার বয়স বেশি হয়নি, হাজার বছরের এই ভাষা, তবু এরই মধ্যে বিশ্বের দরবারে তা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃতের বিপুল শব্দভাণ্ডার আমাদের হাতে, পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে অসংখ্য শব্দ। বিদেশী শাসনের সুবাদেও পেয়েছি শব্দের আর একটি ভাণ্ডার। এইসব শব্দ যেন একেকটি রহস্যলোক। মনে হয় শব্দগুলো জড় নয়, চেতন—তারা স্থির হয়ে থাকে না, ভ্রমণে বেরোয়। নানা অঞ্চলের হাওয়া লাগে তাদের গায়ে, তারা গঠনেও বদলায় অর্থেও বদলায়, এই পরিবর্তনে সভ্যতা ও সমাজ-জীবনের কত কথাই লুকিয়ে আছে। যে শব্দের মানে ছিল দেবতা তা-ই একদিন বোঝালো দৈত্যকে, যে শব্দের অর্থ ছিল সংবাদ তার অর্থ দাঁড়ালো মিঠাই। যে শব্দ ছিল আঁটোসাঁটো তা বদলে হয়ে গেল ঢিলেঢালা, যা ছিল ভিন্‌দেশী তাকে আমরা আদরে সোহাগে এমন ভাবে আপন করে নিলাম, যে যাদের ভাষা তারাই চিনতে পারবে না। কখনও দুটো শব্দকে ল্যাজামুড়োয় এমন করে বাঁধলাম, তাদের পৃথক অস্তিত্ব আর রইল না, কখনো বা ধ্বনি রূপ নিল বস্তুতে, কখনও ভুঁইফোড় সব শব্দ এল মুখে গ্রাম-গঞ্জ থেকে—বিস্ময়ের আর শেষ নেই। এক শব্দ বোঝাতে কত শব্দ। তাদের মধ্যে কেউ পুরাণের কথা টেনে আনছে, কেউ বা বলছে তার স্বরূপের কথা, কেউ বা তার মাধুর্যের কথা। আমাদেরই বাংলাভাষার কোনো শব্দের পাশে তুলনীয় কোনো অন্য ভাষার শব্দ রাখলে তারা পরস্পর যেন কথা বলতে থাকে, কেউ বলে তোমাকে তো চিনি, কেউ বলে তুমি কে গো, যে-ই হও আমি যা ভাবছি তুমিও তো সেইরকমই ভাবছ, তুমি আমি কি কখনও এক জায়গায় ছিলাম ?

এমনি সব শব্দ নিয়ে, শব্দের জন্মকথা নিয়ে গল্পের আসর বসাতে যাচ্ছি– যে গল্পের শেষ নেই।

সংস্কৃত বাংলার জননী।

বাংলায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় সংস্কৃত শব্দ যাকে আমরা বলি তৎসম শব্দ অর্থাৎ তারই মতো। আর সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যেসব শব্দ এসেছে তার সংখ্যাও প্রচুর। এইরকম শব্দকে আমরা বলি তদ্ভব অর্থাৎ যা তার থেকে মানে সংস্কৃত থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। আর যেসব শব্দ উচ্চারণ – বিকৃতিতে সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছে তাদের বলি অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম। এদের সংখ্যাও কম নয়। দেশী শব্দ তাকে বলি যা ভারতের আদিবাসীদের ভাষা থেকে এসেছে।

এই চার রকমের শব্দের মধ্যেই এমন কিছু শব্দ আছে যাদের গড়ে ওঠা এবং বিশেষ অর্থ বহন করার ব্যাপারে কিছু বৈচিত্র্য আছে। এমনি কতগুলি শব্দ নিয়ে আমাদের প্রথম পর্ব – কী করে এল।

কী করে এল

অহংকার

যেমন 'টং' ধ্বনি থেকে 'টংকার', 'হুম্' ধ্বনি থেকে 'হুংকার', তেমনি 'অহম্' ধ্বনি থেকে 'অহংকার'। সংস্কৃত 'অহম্' শব্দের অর্থ 'আমি'।

'অহম্ অহম্' এই ধ্বনির অর্থ 'আমি আমি', অর্থাৎ 'আমি বড়ো', 'আমার মতো কেউ নেই' এই ভাবাটাই অহংকার শব্দের মধ্যে ধ্বনিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একে বলতেন 'আমি আমি' গন্ধ।

আম

মূল শব্দ 'আম্র'। তা থেকে আম। বৈদিকযুগে 'আম্র' শব্দটা ছিল না। এটা পরবর্তী শব্দ। মূল শব্দটি হয়তো ছিল 'অম্র' অর্থাৎ 'অম্ল'। আর্যদের কেউ পূর্বদিকে এসে হয়তো কাঁচা আমে দাঁত বসিয়ে 'অম্ল' অর্থাৎ টক বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল! 'অম্র' শব্দের সঙ্গে একই অর্থে 'অ' প্রত্যয় যোগে 'আম্র' হতে বাধা নেই। আম অবশ্য আমরা 'অম্র' থেকেও পেতে পারি। প্রাকৃতভাষায় শব্দটি 'অম্ব', তাঁর থেকে আঁব, বা 'আম্র'। অঞ্চলভেদে আমের সঙ্গে 'আঁব'ও শোনা যায়। উড়িষ্যায় অবশ্য প্রাকৃত 'অম্ব' শব্দই থেকে গেল।

ইতিহাস

ইতি হ আস– এই তিনটি শব্দ মিলে গড়ে উঠেছে ইতিহাস শব্দটি। আগে গল্প বলতে বলতে কথক বলতেন 'ইতি হ আস' অর্থাৎ 'এইরকমটিই ঘটেছিল'। গল্পের মাঝে মাঝে বাগ্বিধি হিসেবে বার বার 'ইতি হ আস' বলতে বলতে তা একদিন পুরনো দিনের গল্প বোঝাতে হয়ে গেল 'ইতিহাস'।

উজবক

উজবক বা উজবুক শব্দ এসেছে তুর্কী উজবেগ জাতির নাম থেকে। শরীরের দিক দিয়ে তারা শক্তসমর্থ ছিল বটে, তবে বুদ্ধির দিক দিয়ে নয়। সেই কারণে, 'একটু বোকাছোকা গ্রাম্য গোছের' এই ভাবটা প্রকাশে ঐ- 'উজবুক' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। আমাদের 'অজ' আর 'বোকা' শব্দের মিলিত প্রভাবও শব্দটার উপর থাকা অসম্ভব নয়।

ওতপ্রোত

'ওত' আর 'প্রোত' দুটো শব্দের মূলেই আছে 'বে' ধাতু। বে' মানে বয়ন করা (weave) বে+ত = উত। আ+উত = ওত। প্র+উত = প্রোত। ওত = টানা সুতো (woof) প্রোত = পরেন সুতো (warp)। টানাসুতো আর পরেন সুতোয় কাপড় গাঁথা হয়ে গেলে তাদের আর পৃথক করা যায় না। ওতপ্রোত বলতে তাই বোঝায় অঙ্গাঙ্গী বা অচ্ছেদ্য। আমরা বলি সুখদুঃখ মানুষের জীবনে ওতপ্রোত।

কিংশুক

কিংশুক মানে পলাশ ফুল। শুক পাখির ঠোঁটের সঙ্গে এ ফুলের মিল আছে। এই সাদৃশ্যের জন্যে প্রশ্ন এসেছে কিং শুকঃ ? শুক পাখি কি ? এই জিজ্ঞাসা থেকেই হয়তো এই নাম।

কিন্নর

সংস্কৃতে 'কিম্' কথাটা সমাসবদ্ধ শব্দের আগে থাকলে 'খারাপ' অর্থ বোঝায়। কিম্+নর = কিন্নর, অর্থাৎ কুৎসিত নর। এই দেবযোনি অশ্বমুখ নরশরীর অথবা নরমুখ অশ্বশরীর। এই জন্যে তাদের এই নাম।

পাণ্ডুলিপি

আগে 'পাণ্ডুলিপি' শব্দটা চলত না, চলত 'পাণ্ডু লেখ' বা 'পাণ্ডু লেখ্য' শব্দ। ধর্মাদিকরণে অর্থাৎ বিচারালয়ে পূর্বপক্ষ বা বাদী সহজভাবে প্রথমে তা খড়ি দিয়ে মাটিতে বা ফলকে লেখাতেন, পরে তা সংশোধন করে পাতায় লেখাতেন। এই মাটি বা ফলকে লেখাই পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডু মানে 'সাদা'। 'পাণ্ডুলেখ' খুব সম্ভবত সাদা খড়ি দিয়ে লেখা হত। 'পাণ্ডু' নামটির মধ্যে ধরা আছে সেই ইতিহাস। 'পাণ্ডুলেখেন ফলকে ভূমৌ ন্যূনাধিকং তু সংশোধনপশ্চাৎ পত্রে নিবেশয়েৎ। এখন অবশ্য মুদ্রণের আগে কালি দিয়ে কাগজে লেখাকে পাণ্ডুলিপি বলে। ইংরেজি প্রতিশব্দ manuscript অর্থাৎ হাতে লেখা রচনা–

manus = by hand (হস্ত দ্বারা)
scriptes = written (লিখিত)।

পাতলা

যা পাতার মতো তাই পাতলা। 'মতো' অর্থে এই 'লা' প্রত্যয়। পাতা + লা = পাতালা, কিন্তু বাংলা পরপর তিন অক্ষরের শব্দ সহ্যই করে না, তাকে করে নেয় দুই অক্ষরের। তাই 'পাতালা' হয়ে ওঠে 'পাতলা'। [অক্ষর = Syllable]

পালকি

'পালঙ্কী' শব্দই 'পালকি'তে রূপ নিয়েছে। ইংরেজি palanquin ঐ পালঙ্কীরই অনুসরণ। কিন্তু পালঙ্কী এল কী করে ? সংস্কৃত শব্দ 'পর্যঙ্ক' থেকে 'পল্যঙ্ক' তার থেকে পালঙ্ক। বেয়ারা - বাহিত যে যানে 'পালঙ্ক' আছে তাই পালঙ্কী। এখানে 'পালঙ্ক' মানে পালঙ্কের মতো সুখাসন।

বাছুর

গো-শাবক সংস্কৃতে 'বৎস্য'। একই অর্থে 'রূপপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দটি হল বৎস্যরূপ। এর থেকে হল 'বচ্ছরুঅ'। তারপর ক্রমশ 'বাছুর'।

বারাণসী

বরণা আর অসী নদীর মধ্যবর্তী এই নগরী। এই দুই নদীর মিলিত নাম থেকেই এই প্রাচীন নগরীর নাম। 'পুণ্যভূমি বারাণসী' বেষ্টিতা বরণা-অসি'।– এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের এই পঙ্‌ক্তিটি স্মরণীয়।

বরণা + অসি = বরণাসী। এই বরণাসী শব্দে 'অ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দটি দাঁড়াল 'বারাণস', এর পরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ যোগ করে 'বারাণসী'।

বিটকেল

'ভয়ংকর' অর্থে সংস্কৃতে বিকরাল ও বিকটাল, শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । বর্ণবিপর্যয়ে 'বিকটালষ্ঠ হল 'বিটকাল', তাপর 'বিটকেল' ।

বেদড়া

ফার্সীতে 'বদ্' মানে খারাপ আর 'রাহ' মানে পথ । 'বদ্রাহ' মানে যে খারাপ পথে গিয়েছে অর্থাৎ যে কুপথগামী বা দুষ্ট । 'বদ রাহ' শব্দই উচ্চারণ বিকৃতিতে 'বেদ্ড়া' দাঁড়িয়েছে। ছেলেটা কিন্তু বেদড়া " (আলালের ঘরের দুলাল) ।

বোকা

সংস্কৃত 'বুক্ক' মানে ছাগল । 'বুক্ক' থেকে 'বোকা' । ছাগলকে নির্বোধ মনে করা হয়, তাই বোকা মানে দাঁড়ালো, নির্বোধ । 'বোকা'র সঙ্গে পাঁঠা যোগ করে (বোঁকাপাঁঠা) শব্দটার অর্থে আরও জোর দেওয়া হয় ।

বেজি

'বেজ' থেকে সম্ভবত 'বেজি' এসেছে । 'বেজ' এসেছে 'বৈদ্য' শব্দ থেকে । পুরনো বাংলায় বৈদ্য বোঝাতে 'বেজ' কথাটার ব্যবহার ছিল । 'নেউল' যেন বিষবৈদ্য । সে সাপের বিষ তুলে নিতে পারে একথা বিশ্বাস করত লোকে । তুলনীয়– 'বেজি বলে আয় বিষ তোরে আমি কাটি ।'– 'ময়নামতীর গান' ।

ভন্ডুল

সংস্কৃত মূল অজ্ঞাত । প্রাকৃত ভাষায় 'ভংডুল' শব্দ আছে, মানে 'কলহ' । কলহ সব পন্ড করে দেয়– এর থেকে হয়তো 'ভন্ডুল' মানেই দাঁড়িয়েছে 'পণ্ড' ।

ভাড়া

সংস্কৃতে 'ভাটক' মানে বেতন বা মজুরি । 'শকটাদিভাটক' কথাটা মনুসংহিতায় আছে । এই 'ভাটক' শব্দটি প্রাকৃতে হয়েছে 'ভাড়অ' । তারপর বাংলায় হয়েছে 'ভাড়া' ।

ভারত

'ভারতবর্ষ' নাম বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে সমুদ্রের উত্তরে আর হিমালয়ের দক্ষিণে যে দেশ তার নাম ভারতবর্ষ ('বর্ষ' মানে 'দেশ')। সেখানে ভরতবংশের সন্তানেরা বাস করে–'ভারতীর্যত্র সন্ততিঃ'। বোঝা যাচ্ছে ভরত-রাজার নাম থেকে দেশটির নাম হয়েছে 'ভারত'। কিন্তু ভরত নামে অনেক রাজাই ছিল ভারতে। রামচন্দ্রের সহোদরের নাম ছিল ভরত। রাজা দুষ্মন্তের ছেলের নাম ছিল ভরত। কোন্ রাজার নাম থেকে এই নামকরণ এর সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

ভীমরতি

'ভীমরাত্রি' শব্দ থেকে 'ভীমরতি' এসেছে। সপ্তসপ্ততিতম (৭৭) বৎসরের সপ্তম মাসের সপ্তম দিনের রাত্রির নাম ভীমরাত্রি। এই রাত্রি 'নরাণাং দুরতিক্রমা' – এই রাত্র পার করা মানুষের দুঃসাধ্য। অর্থাৎ এই বয়সও যে পার হয়েছে বা এই বয়সে পড়েছে এমন অতি বৃদ্ধের বুদ্ধি লোপ পাওয়াই স্বাভাবিক। তাই ভীমরতি কথাটার মানে দাঁড়িয়েছে বার্ধক্যের দরুন বুদ্ধিহীনতা। তুলনীয় ঃ বাবুরাম অথা অতি, হইয়াছে ভীমরতী। (আলালের ঘরের দুলাল)।

মনসা

'মনস্' শব্দের তৃতীয়ার একবচন 'মনসা'। 'মনসা' মানে মন দ্বারা। তার থেকে মন দ্বারা সৃষ্টা বা উৎপাদিতা। ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ তপোবনে মন দ্বারা এঁকে উৎপাদন করেন। এই জন্যে দেবীর নাম মনসা।

মাদুলি

পল্লীর একটি সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র মাদল। 'ই' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে সাদৃশ্য বোঝাতে। মাদল + ই = মাদলি > মাদুলি। হাতে বা গলায় বাঁধবার জন্যে ছোটো কবচের এই নাম হয়েছে 'মাদলের' মতো দেখতে বলে।

মুখোস

বাংলায় সা, স বা শ প্রত্যয় সাদৃশ্যবাচক। মুখ+স = মুখস, মুখোস। নানারকম মুখের আদলে যা করা হয় তাই মুখোস। মুখে তা পরা হয় বটে তবে, পরিধান অর্থে 'স' প্রত্যয়টি নয়, সদৃশ বোঝাতেই এর প্রয়োগ।

মৃদঙ্গ

মৃদঙ্গ নিয়ে একটু মুশকিলে পড়তে হয়। মৃদঙ্গ খোলকেও বোঝায় আবার পাখোয়াজকেও বোঝায়। খোল মাটিতে তৈরি, তাই মৃৎ (মাটি) অঙ্গ যার এই অর্থে মৃদঙ্গ। কিন্তু পাখোয়াজ তো কাঠের তৈরি, সেখানে 'মৃদঙ্গ' শব্দ প্রযোজ্য হল কেন ? খোল যদি পূর্ববর্তী হয় তাহলে পাখোয়াজ মৃদঙ্গ শব্দের সম্প্রসারণ ঘটেছে বলা যায়। আবার মৃদ্ = মর্দন, তাড়ন। মৃদ্-এর 'মর্দন অঙ্গে যার' এ অর্থ ধরলে তা খোল পাখোয়াজ দুটোকেই বুঝায়।

মোয়া

একি ছেলের হাতের 'মোয়া' ? মোয়া এসেছে সংস্কৃত 'মোদক' শব্দ থেকে (মোদক > মোঅঅ > মোআ > মোয়া)। শব্দটি 'মুয়া' বা 'মো' হিসেবেও মেলে।

'মুয়া মুড়ি মুড়কি'। ভাত রোচে না রোচে 'মো'। ঢ্যাপের মো।

যৌতুক

'যুত' মানে জোড়, জুড়ি।

যুত+ক যুতক একই অর্থে, বোঝায় পতিপত্নী। যুতক বা পতিপত্নীর জন্যে শ্বশুরালয় থেকে প্রাপ্ত বস্তু বা ধন বোঝাতে 'যৌতক'। 'যৌতক' শব্দই স্বরসঙ্গতিতে যৌতুক হয়ে পড়ল।

লিপি

বর্ণ বর্ণমালা বা বর্ণচিত্রণের নাম লিপি। 'লিপি' শব্দটির মূল অর্থ 'লেপন'। 'লেপন' লেখাকে বোঝালো কেন ? আগে গাছের পাতায় আঁচড় কেটে বর্ণবিন্যাস করা হত। তারপর তাতে বর্ণ লেপন করা হত। এর থেকেই লিপি শব্দের জন্ম।

লেখা

সংস্কৃতে 'লিখ্' ধাতুর মৌলিক অর্থ ছিল আঁচড় কাটা। আঁচড় কেটেই আমরা বর্ণবিন্যাস করতাম বলে তাকে লিখন, লেখন বা লেখা বলতাম। মিসর, মেসোপটেমিয়া, চীন ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার দেশেও সবার আগে আঁচড় কেটেই লেখা হয়েছে। আমাদের 'লেখনী' শব্দটিতে আছে তার সাক্ষ্য।

শিখ

গুরুনানকের শিষ্যদের নাম শিখ। 'শিষ্য' থেকেই 'শিখ' কথাটা এসেছে। শিখ মানে মূলত শিষ্য, তা জাতিও বুঝিয়েছে। সংস্কৃতের 'ষ' আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে 'খ'-তে। যেমন পাষাণ > পাষাণ, পাষণ্ড > পাখণ্ড, নিমিষ > নিমিখ।

শ্লীল

'শ্রী' আছে যার এই অর্থে 'ল' প্রত্যয় হয়। শ্রী+ল = শ্রীল। শব্দটির অর্থ শ্রীযুক্ত। আগে শ্রীল শ্রীযুক্ত কথাটা একসঙ্গে ব্যবহার করা হত। 'শ্রীল' শব্দই হয়েছে 'শ্লীল'। সংস্কৃতে 'র্‌' আর 'ল্‌' প্রায়ই অভেদ হয়ে যায়। 'র-লয়োরভেদঃ'। তার মানে 'শ্রীল' মানেও যা 'শ্লীল' মানেও তা – শ্রীযুক্ত। তাই 'অশ্লীল' মানে যা শ্রীহীন বা অশোভন।

সৎমা

'সপত্নী' থেকে 'সতিন' এসেছে। সতিনের সংক্ষিপ্ত রূপ সৎ। 'সতিন-মা' থেকে সৎমা।

সতীর্থ

তীর্থ মানে যেমন দেবস্থান, তেমনি 'তীর্থ' মানে উপাধ্যায় বা গুরু। গুরুগৃহ তো ছাত্রের কাছে দেবস্থানের মতোই। সমান তীর্থ যার = সতীর্থ। একই গুরুর শিষ্য অর্থাৎ সহপাঠী।

সাব্যস্ত

'স-ব্যবস্থ' থেকে এসেছে সাব্যস্ত। ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান = সব্যবস্থ। অর্থাৎ স্থির, নির্ণীত। স-ব্যবস্থ কথাটা উচ্চারণ একটু কঠিনই বটে। তাড়াতাড়ি উচ্চারণে শব্দটার যে অবস্থা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে। মহোৎসব যদি 'মোচ্ছব' হতে পারে স-ব্যবস্থ সাব্যস্ত হলে অবাক হবার কী আছে ?

হরতাল

হর = প্রত্যেক। হরতাল অর্থ প্রত্যেক দোকানে তালা। মূল শব্দটি গুজরাতি। হটতালু বা হড়তালু। হাটবাজারে তালা, অর্থাৎ হাটে বাজারে কেনাকাটা বন্ধ। আমরা এই শব্দটিকে ধর্মঘটের সঙ্গে প্রায় একার্থক করে নিয়েছি।

হবিষ্যি

'হবিঃ' মানে ঘি। হবিস্ + য = হবিষ্য মানে ঘি দিয়ে রান্না নিরামিষ আহার। হবিষ্য থেকে 'হবিষ্যি'।

হরীতকী

'হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ। হরয়েৎ সর্বরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরীতকী।' হরের (শিবের) গৃহে জাত, তাই স্বভাবতই হরি-বর্ণ, সমস্ত রোগ হরণ করে তাই তার নাম হরীতকী।– শাস্ত্রবচন থেকে হরীতকী নামের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। এবারে বৈয়াকরণিকরা কী বলেন দেখা যাক্। তাঁরা বলেন হরি (= হরিতবর্ণ) + ইত (প্রাপ্ত) হরীত + ক (সংজ্ঞা বোঝাতে) + ঈ (স্ত্রীলিঙ্গ) = হরীতকী। মূল ব্যুৎপত্তির সঙ্গে উদ্ধৃত শ্লোকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো।

হাতেনাতে

'লোপ্ত্র' মানে চোরাই মাল। লোপ্ত্র থেকে অনেক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এল 'লোত্'। লোত হল 'নোত' (লেবু যেমন হয় নেবু)। হাতে 'নোত' সমেত ধরা পড়ল চোর। অর্থাৎ হাতে নোতে ধরা পড়ল সে। এই 'হাতেনোতে' হয়ে গেল হাতেনাতে। 'হাত' শব্দই নোতকে 'নাত' করে ছাড়ল। একে বলে স্বরসঙ্গতি। এক স্বরের প্রভাবে অন্য স্বরের পরিবর্তন।

হেংলা

'হেঙ্গল' মানে কুকুর। হেঙ্গল+আ (সাদৃশ্য) = হিঙ্গলা > হেংলা অর্থাৎ কুকুর যেমন খাবারের আশায় আসে, তেমনি। এর থেকে হেংলা মানে দাঁড়াল 'লোভী'।

বন্ধুশব্দ : ইংরেজি

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হল একদিন। আমরা দুশো বছরে কী পেলাম ইংরেজদের কাছ থেকে তার হিসেবনিকেস করতে বসছি না। শুধু বলছি এই দীর্ঘসময়ের সম্পর্কে প্রচুর ইংরেজি শব্দকে আমরা নিজের করে নিয়েছি। এর মধ্যে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোতে ইংরেজি মল উচ্চারণ মোটামুটি বজায়

আছে, আর এমনকিছু শব্দ আছে যাতে বাংলাভাষার নিজস্ব ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা কার্যকর হয়েছে।

এই পর্বে আমরা এমন কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বিশ্লেষণ করব যাদের জন্মকথা সত্যিই আশ্চর্য।

প্রসঙ্গত অন্যান্য দেশের কিছু শব্দও আলোচিত হয়েছে।

অ্যালার্ম (alarm)

এক্ষুনি অস্ত্র ধরো– এই জরুরি কথাটি বলতে ইতালিয়রা চেঁচিয়ে উঠত : all arme. এই ইতালীয় all arme কথাটাই পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে 'alaram' এ। এলার্ম ঘড়ি আমাদের জরুরি সংকেত দেবার জন্যেই – এক্ষুনি উঠে পড়। অ্যালার্ম কথাটাকে ভেঙে একটি ছড়ায় রবীন্দ্রনাথ করেছেন অ্যালারাম। "অ্যালারামের ঘড়িটা যে চুপ রয়েছে কই সে বাজে ?"

অ্যালজ্যাবরা (algebra)

চমকে উঠলে কী হবে ? মূল অর্থটা হচ্ছে হাড় ঠিক মতো লাগানো। আরবী 'আল্' হল নির্দেশক ইংরেজির 'the'. আর 'জিব্‌র' মানে যা ভাঙা তাকে জোড়া দেওয়া'। এক সময়ে setting of bones বোঝাতে 'অ্যালজিব্‌র্' শব্দটার চল ছিল।

সম্পূর্ণ আরবী কথাটা ছিল ইল্‌ম্ আলজিব্‌র্ ওয়ল্ মুকাবলা (ইং reduction and comparcion of equation)। এর থেকেই অ্যালজ্যাবরার আধুনিক অর্থ এসেছে।

অ্যালবাম (album)

অ্যালবাম কথাটার মানে 'সাদা'– যাতে কিছু লেখা নেই। সাদা বা ফাঁকা রাখার মানে তাতে অন্য কিছু আটকে বা সেঁটে দেওয়া যায়। এখন অ্যালবাম কথাটার অর্থ সম্প্রসারিত হয়েছে। ছবির অ্যালবাম, ফোটোর অ্যালবাম, চিঠির অ্যালবাম ইত্যাদি।

অ্যাটলাস (atlas)

অ্যাটলাস প্রাচীন গ্রীসের একজন অর্ধ-দেবতা। প্রচণ্ড শক্তিতে তিনি স্বর্গ-মর্ত্য-পৃথক করা স্তম্ভ নিয়ন্ত্রণ করতেন। পরে তাঁকে এমন শক্তিধর মনে করা হয়েছে যে ভূমণ্ডলটাই তিনি পিঠে করে রাখতে পারেন। অ্যাটলাসের সঙ্গে ভূমণ্ডল সংযুক্ত হওয়াতেই ভূগোলের মানচিত্র তার নামে চিহ্নিত হয়েছে।

আম্পায়ার (umpire)

কথাটার মূল অর্থ যিনি এক নন বা সমান নন দু পক্ষ থেকে আলাদা। এর থেকেই কথাটি 'ক্রীড়া-বিচারক' অর্থে চলে আসছে। মূল কথাটি ছিল a noumpere. তারপর কথাটা দাঁড়াল an oumpere. পরে 'an' বাদ দিয়ে শুধু oumpere. বহুদিন বাদে 'oumpere' বানানটা umpire দাঁড়ালো। আগে উচ্চারণ ছিল উম্‌পায়ার পরে হল আম্‌পায়ার।

এক্‌স্‌রে (x-ray)

'একস্ রে' কথাটির মানে অজ্ঞাত রশ্মি। ১৮৯৫ সালে ভিলহেলম্ কন্‌রাড্ ফন্ রোয়েন্ট্‌গেন (Wilhelm Konrad Roentgen) তাঁর আকস্মিক আবিষ্কারের নাম দিলেন X-strahlen. Strahlen ইংরেজি অনুবাদে হল -rays দুয়ে মিলে x-rays. X=unknown, অজ্ঞাত।

ওকে (ok)

সারা পৃথিবীর মানুষ এখন দিনে হাজারবার এই শব্দটি উচ্চারণ করছে।

'ঠিক আছে' – এই অর্থে দুটি বর্ণের এই সংক্ষিপ্ত শব্দটি এখন আন্তর্জাতিক।

শব্দটি এসেছে আমেরিকা থেকে। এক শতাব্দী-কাল নানা জল্পনা-কল্পনা চলেছিল শব্দটির জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে, যার নিরসন হল ১৯৪১ সালে। ঐ বছর Saturday Review of Literature পত্রিকায় Allen Walker Reader-এর একটি বিশেষ রচনা থেকে শব্দটির উৎসে পৌছনো সম্ভব হল।

এই প্রবন্ধ থেকে জানা গেল OK club গঠিত হয়েছিল নিউইয়র্কে ১৮৪০ সালে। আমেরিকার অষ্টম প্রেসিডেন্ট Martin Van Buren-এর সমর্থকদল এই ক্লাব গড়েছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হবার লড়াইয়ে নামলে এই ক্লাব তাঁর হয়ে প্রচারে নেমেছিল। Van Buren এর জন্ম নিউইয়র্কের Old Kinderhook-এ। সেখানে তিনি ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। Ok কথাটা ঐ Old Kinderhook-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। শব্দটি যেমন ক্লাবকে বোঝাতো তেমনি বোঝাতো Van Buren-কেও। OK কথাটা হল তাঁদের দলের প্রতীক শব্দ।

প্রচারকদের বলা হল OK কে বিজয়ী করুন তাহলেই সব ঠিক বা all right. এর থেকেই কথাটির এই অর্থ দাঁড়ালো।

ওমলেট (omelette)

মূল অর্থ পাতলা প্লেট বা পাতলা ব্লেড। খাবারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। ফরাসী কথাটা নানা বিভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে omelette-এ রূপ নিয়েছে। চাটুতে তাপ পাবার পর পাতলা ছড়িয়ে পড়া চেহারা থেকে হয়তো ঐ নামটি এসে থাকবে।

কফি (coffee)

৮৫০ সাল। কালদি নামে এক রাখাল দেখল তার ছাগলগুলো একধরনের পাতা খেয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে চলা ফেরা করছে। নিজেই সে ঐ পাতা খেল পরীক্ষা করার জন্যে। খেয়ে দেখল শরীরটা বেশ চাঙা লাগছে। শুরু হয়ে গেল ঐ পাতাই জলে ফুটিয়ে খাওয়া। আরবরা পানীয়টাকে বলল 'কাহ্‌য়ে' (qahwe) ফরাসী উচ্চারণে তা হল কাফে (cafe) ইংরেজিতে হল কফি (coffee).

কলেজ (college)

College কথাটা দুটো শব্দের মিলনে 'col' (with) আর 'lego' (choose). অর্থাৎ college মানে chosen together— একই সঙ্গে নির্বাচিত। অর্থাৎ এক কাজের জন্যে যেখানে কিছু মানুষ নির্বাচিত হয়ে যায় তাই হল কলেজ। এখন 'কলেজ' বলতে আমরা বুঝি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে নির্বাচত হয়ে যেখানে ছাত্রেরা মিলিত হয় সেই প্রতিষ্ঠান।

কারফিউ (curfew)

মূল অর্থ 'আগুন ঢাকো'। মধ্যযুগে ইওরোপে একটি নিয়ম চালু ছিল– সন্ধ্যায় বিশেষ একটি ঘন্টা-ধ্বনি হলেই সব বাড়িতে আগুন ঢাকা দিতে হবে, অথবা আগুন নিভিয়ে ফেলতে হবে। পরে এর অর্থ দাঁড়ালো নির্দিষ্ট সময়ের পর সারারাত আর কেউ বাইরে বেরুতে পারবে না। ফরাসী couvre feu (কুভ্‌র্ ফা) কথাটির ভুল উচ্চারণে 'কারফিউ' কথাটি এসেছে।

কেমিষ্ট্রি (chemistry)

মূল অর্থ সোনার খোঁজ। প্রাচীন অপ-রাসায়নিকেরা নিম্নশ্রেণীর ধাতুকে সোনায় পরিণত করতে চেষ্টা করত। আরবে এই বিদ্যা 'আল্-কিমিয়া' নামে চলত। এই শব্দটি থেকেই alchemy শব্দটা এসেছে। alchemy তে যারা পারদর্শী তারা হল alchemist. পরে alchemist এর 'al' বাদ দিয়ে শুধু chemist. Chemist থেকে chemistry.

গোরিলা (gorilla)

খৃষ্টপূর্ব ৫ম ও ষষ্ঠ শতকে Hanno আফ্রিকায় একটি বন্য লোমশ জন্তু দেখে ফিনিসিয় ভাষায় একটি বিজ্ঞপ্তি লেখেন। পরে এটি গ্রীসভাষায় অনূদিত হয়। জন্তুটির নাম 'গোরিলা' বলে নির্ধারিত হয় ১৮৪৭ সালে। 'গোরিলা' শব্দটির অর্থ সম্ভবত বন-মানুষ বা লোমশ মানুষ। শব্দটি আফ্রিকার আদিবাসীদের।

জিমন্যাষ্টিক্স্ (gymnastics)

গ্রীস্ম Gymes মানে নগ্ন, খালি-গা। Gymestic মানে নগ্নদেহে ব্যায়ামাদি। পৃথিবীর প্রথম বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক Hippoerates (খৃষ্টপূর্ব) বিশ্বাস করতেন নগ্নদেহে ব্যায়ামই স্বাস্থ্যকর। অলিম্পিকেও প্রথমদিকে দৌড় এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায় নগ্নদেহই আবশ্যিক ছিল। পরে এ নিয়ম উঠে যায়।

টর্চ (Torch)

টর্চ কথাটির মূল অর্থ পাক (twist)। শন পাকিয়ে পাকিয়ে যে লম্বা দণ্ড তৈরি হত তাতেই আগুন ধরানো হত। বাংলায় এই অর্থে ব্যবহৃত 'মশাল' কথাটি আরবী।

টিকিট (Ticket)

টিকিট কথাটির মূলে আছে চিহ্নিত করা বা টিক দেওয়ার অর্থ। টিকিট হল 'টিকদেওয়া' কিছু অর্থাৎ আমাদের প্রবেশাদি বিশেষ অধিকার নির্দেশক কাগজ বা কার্ড।

টেনিস (Tennis)

টেনিস এসেছে ফরাসী 'tenir' শব্দ থেকে। Tenir মানে ধরা।

টেলিগ্রাম (Telegram)

টেলিগ্রাম, - গ্রাফ (Telegram,-graph)

টেলিফোন (Telephone)

টেলিভিশন (Television)

এই শব্দগুলিতে tele = দূর, দূরে।

টেলিগ্রাম শব্দের 'গ্রাম' (gramma) বোঝায় 'লেখা' । Telegraph শব্দের দ্বিতীয় পদটিও সমার্থক । ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বাংলা তর্জমা হবে 'দূরলিখন' ।

Telephone মানে দূর-ধ্বনি, তার থেকে দূরভাষণ । Phone = ধ্বনি ।

'ভিশন' মানে দর্শন । তাই টেলিভিশন মানে দূরদর্শন । আগে 'দূরেক্ষণ' শব্দটা চলত ।

ট্যাক্সি (Taxi)

একটি খণ্ড শব্দ । সম্পূর্ণ কথাটি Taximeter cabriolet অর্থাৎ চার্জমিটার লাগানো দ্রুতচলা গাড়ি । Cabriolet কথাটার মধ্যে আবার একটু মজার আছে । Cabriolet শব্দটি লাফিয়ে ওঠা জন্তুর পা (বিশেষ করে ছাগলের) বোঝায় । ঐ পা গতির নির্দেশক । Cabriolet এর বাংলা করা যেতে পারে হাওয়া-গাড়ি ।

ট্রাম (Tram)

Tram-Car কথাটির সংক্ষিপ্ত বা লাতিন 'Trame' কথাটির মানে লোহার লাইন । তার মানে দাঁড়ালো লাইনে টানা মোটর গাড়ি ।

ডলার (Dollar)

ষোড়শ শতকে টাকা তৈরি হয় বোহিমিয়ার রুপোর খনি থেকে । টাকশালটা ছিল Joachimsthal valley তে । মুদ্রাগুলি ওই valley-র নামে চলত । Thac মানে valley. মুদ্রাগুলিকে সংক্ষেপে বলা হত thaler. এই thaler কালক্রমে 'dollar' হয়েছে ।

ডিনার (dinner)

ইং ডাইন (dine) এসেছে ফরাসী 'diner' থেকে । এই 'diner' এসেছে লাতিন dis = not এবং jejune=fast. তার মানে dinner কথাটার মৌলিক অর্থ 'not fasting' অর্থাৎ অনুপবাস ।

পপ (pop)

জনপ্রিয় কনসার্ট বা গান বোঝাতে যে 'পপ' শব্দটি চলে তা 'popular' শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ ।

পিয়ানো (piano)

'পিয়ানো' শব্দটি 'pianoforte' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইতালিয় পিয়ানো মানে 'মৃদু' (soft) আর forte মানে উচ্চ বা তার (loud). Christofori ১৭১১ সালে যখন এই বাদ্যযন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন এই soft & loud বাদ্য কোনো ইতালীয় শব্দ যন্ত্রটির সঠিক পরিচয় দেবে।

পেনসিল (pencil)

'পেনসিল' কথাটার মানে আসলে ছোটো লেজ। তখন লিখতে বা আঁকতে যে তুলি ব্যবহার হত তা দেখতে ছোট্ট লেজের মতোই ছিল।

প্যারাগ্রাফ (paragraph)

প্যারাগ্রাফ কথাটার মূল অর্থ প্যারা-লিখন। আগে রচনাগুলি আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে ভাগ না করে একসাথে লেখা হত, শুধু বিভাগ বোঝাবার জন্যে একটা ছোট্ট লাইন থাকত। ঐ লাইনের নাম ছিল প্যারাগ্রাফ।

পোষ্ট (post)

আগে ডাক ব্যবস্থায় যে রাস্তায় সংবাদ যাবে সেই রাস্তায় নির্দিষ্ট ব্যবধানে Post (খুঁটি) থাকত। এই পোষ্টে লোক বা ঘোড়া বদল হত। ডাক ব্যবস্থায় এই post শব্দটা থেকেই গেল।

ফোটোগ্রাফ (photograph)

ফোটো = আলো। গ্রাফ = লেখা। ফোটোগ্রাফ কথাটির অর্থ আলো দিয়ে লেখা। লেন্স্ দিয়ে আলো এসে ফিল্মে ছাপ রেখে যায়। তাই তা আলোর লেখা।

বয়কট (boycott)

ক্যাপ্টেন চার্লস্ কানিংহাম বয়কট (Captain Charles Cunningham Boycott) ছিলেন আয়র্লণ্ডের Earl of Erne এর ল্যাণ্ড-এজেন্ট। ১৮৮০ সালে তিনি যখন খাজনা আদায় করতে গেলেন তখন কৃষকেরা আইরিশ ল্যাণ্ড লীগের নেতৃত্বে খাজনা দেওয়া বর্জন করল। চার্লস বয়কটকে কোনো দোকান কিছু বিক্রি করে নি। অনাহার থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে

এলেন ইংলণ্ডে। এই বয়কট সাহেবের নাম থেকেই 'বয়কট' কথাটা এসেছে কোনো কিছু বর্জনের আন্দোলনকে বোঝাতে।

বস্ (boss)

ডাচ কলোনিষ্টরা যখন নিউইয়র্ক নগরীর প্রতিষ্ঠা করল তখন তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তাকে 'baas' বলা হত, ওটা ডাচ শব্দ। এই baas ই ইংরেজিতে 'boss' হয়েছে। এ ধরনের শব্দ ইংরাজিতে আসবার জন্যে ১৮৩৮-এ বিক্ষোভ জানিয়েছিলেন ঔপন্যাসিক J. Fenimore Cooper. কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নি।

বাজেট (budget)

বাজেট মানে আসলে টাকার থলি। আগে ঐ টাকার থলি উল্টে সব টাকা বের করে হিসেব করা হত। এর থেকেই বাজেট মানে estimate বা পরিকল্পিত হিসেব বুঝিয়েছে।

ব্যাডমিন্‌টন (badminton)

ডিউক অফ বিউফোর্ট-এর সুন্দর একটি জমি ছিল ইংলণ্ডের গ্লাউসেস্টরশায়ারে। ঐ জমিটার নাম ছিল ব্যাডমিন্টন। ভারত থেকে ব্যাট আর কর্কের বিশেষ একটি খেলা গেল ইংলণ্ডে, প্রথম খেলা হল ঐ ডিউকের মাঠে, ১৮৭৩ সালে। খেলাটার নাম হয়ে গেল ব্যাডমিন্টন। এটা যে আসলে ভারতের খেলা তা আর আজ বোঝবার উপায় নেই।

ব্যালট (ballot)

ব্যালট মানে ছোটো বল। কথাটা এসেছে ইতালীয় ballota থেকে। এখন ব্যালট কথাটা বোঝায় এমন একটি কাগজ যাতে প্রার্থীর নামের প্রতীক চিহ্নে ছাপ মারে ভোট- দাতারা। যে শব্দটির মূল অর্থ ছোটো বল, তা ঐ বিশেষ ধরনের ভোট-পত্র বোঝালো কী করে ? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় একটি প্রাচীন গ্রীক প্রথায়। গ্রীস দেশে সমর্থন বোঝাতে ভোটদাতারা একটা বাক্সে ফেলত সাদা বল আর বিপক্ষতা বা বিরুদ্ধতা বোঝাতে ফেলত কালো বল। এই প্রাচীন প্রথা অন্যান্য দেশেও চালু ছিল। আধুনিক যুগেও কোথাও কোথাও বিশেষ কোনো সংস্থায় নতুন সদস্য নির্বাচনে বাক্সে সাদা বা কালো বল ফেলার প্রথা প্রচলিত আছে। ইংরেজিতে ক্রিয়াপদ হিসেবে 'ব্ল্যাকবল' কথাটার মানে দাঁড়িয়েছে বিপক্ষতা করা।

ইংরেজি bullet কথাটির মানেও ছোটো বল, এ-কথাটির উৎস ফরাসী boulette. ব্যালটের অর্থে এই বুলেট কথাটিরও প্রয়োগ ছিল । এ কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় (১৫৭৮-১৫৪৪) নাইটদের সম্বন্ধে George Sandy-এর কটি পংক্তিতে-- who gave their voice by bullet, as do Venetians. অর্থাৎ তারা ভেনিসবাসীদের মতো বুলেট দিয়ে তাদের মত জানাতো ।

ভিটো (veto)

কর্তৃত্ববলে বা পদাধিকারবলে নিষেধাজ্ঞাকে ভিটো বলে। লাতিন veto মানে I forbid অর্থাৎ আমি নিষেধ করছি । রোমান সেনেটের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে জনগণের ট্রিবিউন এই ক্ষমতা প্রয়োগ করত ।

ম্যাগাজিন (magazine)

আরবীতে 'মখজন' মানে 'ভাণ্ডার'; যেখানে শস্যাদি রাখা হয় । শব্দটা ইংরেজিতে হল ম্যাগাজিন, –ভাণ্ডার বটে, তবে শস্যের নয়, জ্ঞান-শস্যের ।

ম্যাপ (Map)

লাতিন মাপ্‌পা (mappa) থেকে এসেছে শব্দটা । মাপ্‌পা মানে কাপড় । বিশেষ একধরনের কাপড়ে মানচিত্র আঁকার রেওয়াজ থেকে 'ম্যাপ' মানে দাঁড়িয়েছে মানচিত্র ।

আমেরিকা (America)

নতুন দেশের সন্ধানে কলম্বাস সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে । ইতিমধ্যে ইতালীয় নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি দক্ষিণ আমেরিকার ৬০০ মাইল উপকূল পর্যটন করে ফেলেন ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে ভেসপুচির পর্যটনের বর্ণনা দিয়ে একটি বই বেরোয় । এই বইয়েই প্রথম আমেরিকার নাম দেখা যায় । 'Amerigo'-র নাম থেকেই দেশটার নাম হয়েছে America । লাতিন (আমেরিকাস)

ব্ল্যাকমেল (blackmail)

ব্ল্যাকমেইলের 'মেইল্' (mail) শব্দটি ইংরেজি নয়, স্কচ । স্কচমেল মানে ভাড়া, বা মাসিক খাজনা । ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে এক সময় দস্যুর উপদ্রব ছিল । এরা জোর

করে যে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত । এই আদায় 'ব্ল্যাক' বা অবৈধ । কিন্তু ভয়ে ভয়ে কৃষকেরা এই black rent দিত, না হলে সর্বস্ব লুটে নেবে ঐ দস্যুরা । এর থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ভয় দেখিয়ে টাকা নেওয়া' ।

বিউগল্ (bugle)

পুরানো ফরাসী ভাষায় bugle মানে ছিল মোষ । ঐ মোষের শিঙ দিয়ে তা তৈরি হত বলে তাকে বলা হত bugle horn অর্থাৎ মোষের শিঙ থেকে তৈরি হর্ন । শেষে 'horn' কথাটা তুলে দেওয়া হল শুধু 'bugle' কথাটিই হর্নকে বোঝালো ।

ক্যাডেট (cadet)

লাতিনে caput মানে বোঝাত মানুষের মাথা । পরে ছোটো মাথা বোঝাতে আঞ্চলিক ভাষায় capdet কথাটা চলত । 'মাথা' না বুঝিয়ে ব্যঞ্জনায় তা বোঝাত 'প্রধান' । ফরাসী দেশে হয়ে গেল cadet, মানে দাঁড়ালো ছোটো ছেলে । ঐ ফরাসী cadet শব্দ যখন ইংলণ্ড সফরে গেল তখন অর্থটা একটু নিচুর দিকেই গেল, বোঝালো বলকুডুনে ছেলে । তারপর আবার অর্থের উন্নতি ঘটল, শব্দটি পেল আজকের অর্থ– 'সামরিক শিক্ষানবিস বালক' ।

ক্যামেলিয়া (camellia)

জর্জ জোসেফ কামেল (George Joseph Kamel) নামে একজন পাদ্রী পর্যটক প্রাচ্য থেকে প্রথম এই ফুলের নমুনা আনেন । প্রখ্যাত সুইডিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী LINNAEUS জর্জ কামেলের নামে এই ফুলটিকে চিহ্নিত করলেন 'কামেলেয়া' নামে । কামেলিয়া Kamel-এর লাতিন রূপ ।

ক্যান্সেল (cancel)

লাতিনে কালির জাফরি-দাগকে বলে Cancelli. পোষ্ট অফিসে ডাক টিকিটের ওপর কালির ঐ জাফরি ছাপ দেওয়া হত । ছাপটার মানে হল ঐ স্ট্যাম্প আর ব্যবহার করা যাবে না । এর থেকে শব্দটির অর্থ দাঁড়ালো বাতিল করা ।

ক্যাপিটাল (capital)

লাতিন caput মানে মাথা । এই অর্থেই capital কথাটা এসেছে caput থেকে । এই caput থেকেই এসেছে আরকাট শব্দ – cattle অর্থাৎ গোধন । তখন গোধন দিয়ে সম্পদের বিচার হত, তাই capital মানে দাঁড়ালো সম্পদ বা মূলধন ।

কম্‌রেড (comrade)

কমরেড মানে আগে ছিল 'রুম্‌মেট' (room mate), লাতিন কামেরা মানে কক্ষ বা ঘর। লাতিন camera স্পেনে গিয়ে হল camara. সরাইখানায় এক ঘরে যারা থাকত তারা হল camarada অর্থাৎ roommate. ফ্রান্সে গিয়ে হল 'camarade', ইংরেজিতে এল 'comrade' হয়ে। এই কমরেড মানে দাঁড়ালো অন্তরঙ্গ সঙ্গী, সহকর্মী (সমাজতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক সহকর্মী)।

কাল্‌প্রিট (culprit)

কালপ্রিট কথাটা এসেছে আদালতের ভাষা থেকে। মধ্যযুগে ইংলণ্ডে অভিযুক্তরা বলত 'আমরা অপরাধী নই'। জবাবে কোর্টের ক্লার্ক বলত culpable : prest d' averrer nostre bille. অর্থাৎ 'হাঁ অপরাধী, আমি তা প্রমাণ করব'। এই উক্তিটি সংক্ষিপ্ত করে লেখা হত culpable : prest. ক্রমশ তা আরও সংক্ষিপ্ত হল– cul.prest., ক্রমশ prest-এর জায়গায় এল সমার্থক 'prit'. কথাটা দাঁড়ালো 'culprit'.

ডালিয়া (dahlia)

ফুলটা আসলে মেক্সিকো এবং মধ্যআমেরিকার। ব্রিটেনে তা প্রথম আসে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে। ফুলটার ডালিয়া নাম হল সুইডেনের প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডাল (Dahl)-এর নাম থেকে।

ডিক্‌শনারি (dictionary)

Diction মানে কথা। '—ary' প্রত্যয়টার মানে 'আধার'। diction অর্থাৎ কথা বা শব্দের ary বা আধার। grain যেখানে থাকে তা হল granary.'. Diction যেখানে থাকে তা হল dictionary – শব্দকোষ বা অভিধান।

ফারেনহাইট (fahrenheit)

এই বিশেষ তাপমানটি অষ্টাদশ শতকে আবিষ্কার করেন Gabriel David Fahrenheit. তাঁর নামেই এই তাপমানটির নামকরণ। Fahrenheit ছিলেন জার্মান কিন্তু মজা এই জার্মানরা সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারই ব্যবহার করেন। সুইডিশ আবিষ্কারক Calsius-এর নাম সম্পর্কিত করে তাঁরা সেন্টিগ্রেড কে বলেন celsius.

গ্রামার (grammar)

গ্রীক gramma মানে 'বর্ণ'। এই বর্ণ-জ্ঞানবিষয়টিকে গ্রীস দেশে বলা হত grammatike techne. এই কথাটি লাতিনে হল grammatica, পুরনো ফরাসীতে grammare, ইংরেজিতে grammar.

গল্‌ফ্ (golf)

ক্লাব-বাচক ডাচ শব্দ Kalf থেকে সম্ভবত 'গল্‌ফ' এসেছে। হলাণ্ডেই এর শুরু, তারপর স্কটল্যাণ্ডে এসে শব্দটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গভর্নর (governor)

গভর্নর মানে আগে ছিল জাহাজ-পরিচালক। গ্রীক Kybernao. মানে জাহাজ পরিচালনা করা। লাতিনে শব্দটি দাঁড়ালো guberno, ক্রমশ ইংলণ্ডে গিয়ে হল governor. তখন 'রাজ্যপরিচালক' অর্থে চালু হল শব্দটি।

হটেন্‌টট (hottentot)

ডাচরা যখন উত্তমাশা দ্বীপে এল তখন তার বা তাদের ভাষার একবর্ণও বুঝতে পারল না। শুধু অনেকটা তোতলামির মতো করে উচ্চারণ 'hot' or tat আওয়াজটা তারা ধরতে পারল। ঐ আওয়াজ থেকেই তারা ঐ আদিবাসীদের নামকরণ করল hot-en-'tot'. ওলন্দাজ ভাষায় 'en' মানে 'এবং'।

হাইফেন (hyphen)

দুটো শব্দকে যে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে জোড়া হয় তার নাম হাইফেন। গ্রীক হাইফ হেন (hyph' hen) থেকে শব্দটি এসেছে। এর অর্থ 'একটির অধীনে' অর্থাৎ একসঙ্গে। Hyph' hen শব্দটি প্রথমে ছিল ক্রিয়াবিশেষণ (Adverb) স্থানীয়।

পোচ (poach)

পুরানো ফরাসী 'poacher' মানে একটি থলির মধ্যে রাখা। 'পোচ' মানে থলি। সাদার মধ্যে কুসুমটাকে রাখা হয় বলে একে 'পোচ' বলে।

'প্ল্যাটফর্ম (platform)

Platform আসলে flat-form. কাঠের পাটাতন সমতল করে তৈরি হত বলে একে flatform বলা হত, ফরাসী প্রভাবে flatform শব্দটি platform হয়েছে। ফরাসীতে Plat শব্দটি Flat অর্থে ব্যবহৃত।

রিলে (relay)

শব্দটি মূলত শিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'রিলে' বলতে বোঝাত একদল সংরক্ষিত শিকারী কুকুর। আর এক দল ক্লান্ত হয়ে পড়লেই এই সংরক্ষিত দলটিকে লেলিয়ে দেওয়া হত। এর থেকে অর্থ দাঁড়ালো ক্লান্ত কর্মীদের বিশ্রামের জন্য নূতন কর্মীদল। পরে খবর পেয়ে অন্যদের জানানোর অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়, এখন ক্রীড়াদির প্রত্যক্ষ দর্শনকে অন্যের কাছ খবর হিসেবে সরবরাহ করার অর্থে এ শব্দটি চলে।

রোবোট (robot)

চেক robotnik কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ robot, robotnik মানে 'দাস'। মূলে যে ধাতুটি আছে তার মধ্যে আছে কাজ করার অর্থ। তা হলে robot মানে দাঁড়ালো যে যন্ত্রকে দাস হিসেবে ব্যবহার করা যায়, বা কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।

টোস্ট (toast)

পুরনো ফরাসী 'toster' মানে পোড়ানো বা সেঁকা। ইংরেজিতে বিশেষ্য বোঝাতে toast কথাটির চল হয়েছে। আসলে এটি বিশেষণ। toast মানে যা দগ্ধ বা যা সেঁকা হয়েছে। বাংলা এখন শব্দটি সেঁকা পাঁউরুটি বোঝাতে চলে।

থিয়েটার (theatre)

'থিয়েটার' মানে আসলে 'দেখার মতো কিছু'। গ্রীক শব্দ 'thea' মানে কোনো কিছু চেয়ে দেখা। Theatron মানে কিছু দেখবার জায়গা। লাতিনে theatron হল theatrum, ইংরেজিতে গিয়ে হল theatre অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহ। বাংলায় 'থিয়েটার' শব্দটাকে নাটক বলে। থিয়েটার দেখে এলাম।

ট্র্যাজিডি (tragedy)

প্রাচীন গ্রীসে চারণেরা গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়াত। aidos মানে 'গায়ক', আর tragos মানে ছাগল। tragos আর aidos মিলে কিছু ধ্বনি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে tragedy হয়েছে, মূলত যার মানে দাঁড়ায় 'অজ-গীতি'। কিন্তু অজ বা ছাগলের সঙ্গে গানের বা পালা-গানের সম্বন্ধটা কী ?

Lesbes অঞ্চলের Arion নাকি ছাগলের চামড়ায় সেজে একটি বিষাদ নাটকে অভিনয় করেছিল। তার থেকে tragedy কথাটি বিয়োগান্তক নাটক বোঝাতে ব্যবহৃত।

সাবোতাজ (sabotage)

'সাবোতাজ' এসেছে ফরাসী sabat শব্দটি থেকে। 'Sabat' মানে কাঠের জুতো। চামড়ার জুতো দামী বলে গরিব চাষীরা কাঠের স্যাণ্ডাল পড়ত। এই 'sabat' কথাটাকে ফরাসী ক্রিয়াপদ করে নিল (sabater) যার মানে দাঁড়ালো পা দিয়ে মাড়ানো, তার মানে কোনো জিনিস পায়ে দলে নষ্ট করা। রাজনৈতিক পটভূমিতে কথাটার মানে দাঁড়ালো মেশিনপত্র নষ্ট করে ধর্মঘটের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে 'sabotage' মানে দাঁড়িয়েছে গুপ্তঘাত। যে 'sabat' থেকে ফরাসীরা 'sabotage' শব্দটি পেয়েছে, তা মূলত আরবী শব্দ 'সব্বৎ' যার অর্থ স্যাণ্ডাল।

রেস্ট্রঁ্যা বা রেস্তর‍্যাঁ (restaurant)

শব্দটি ফরাসী থেকে ইংরেজিতে এসেছে। লাতিন ও ফরাসীতে restaurer মানে renew বা refresh করা অর্থাৎ চাঙ্গা করে তোলা। আগে ফ্রান্সে কফি হাউস গুলোতে অনেক সময় লেখা থাকত 'এখানকার পানীয় বা খাবার আপনার শ্রম দূর করে আপনাকে চাঙ্গা করে তুলবে।' চাঙ্গা করে তোলা বোঝাতে 'restaurer' ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করা হত, ইংরেজি 'restore' শব্দটির সঙ্গে যা সমার্থক। ধাতুমূল 'restaur' এর সঙ্গে 'ant' প্রত্যয় যোগ করে restaurant শব্দটি তৈরি হয়েছে। যা restaur (ইং restore) করে তা restaurant. (যেমন যে serve করে সে servant)।

পরে বসে খাবার দোকান বা জলখাবারের দোকান বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে।

ফরাসী উচ্চারণে শব্দটি 'রেস্তর‍্যা', ইংরেজি উচ্চারণে 'রেস্ট্রঁ্যা'। সাধারণত আমরা উচ্চারণ করি 'রেস্টর‍্যান্ট' বা 'রেস্টুরেন্ট'।

বন্ধু শব্দ ঃ আরবী ফার্সী

ইংরেজদের ভারতে আসার বহু আগেই ভারতে মুসলিম শাসন হয়েছিল। দীর্ঘকাল হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বাস করার ফলে বহু আরবী ফার্সী শব্দ (তা প্রায় হাজার চারেকের মতো) বাংলাভাষায় এসেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মূল উচ্চারণ এমনভাবে বদলে গিয়েছে তাকে আর চেনবার উপায় নেই। ইংরেজি ভাষা প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে ছিল কিন্তু আরবী ফার্সী শব্দ পল্লী অঞ্চলেও সমান প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজির ক্ষেত্রে অর্থ পরিবর্তন তেমন ঘটেনি কিন্তু– বাংলায় আরবী-ফার্সী শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে বহুক্ষেত্রে।

বাংলায় বহুলপ্রচলিত কিছু আরবী-ফার্সী শব্দের বিশ্লেষণ এই পর্বে করা হয়েছে।

আজগবি, আজগুবি

যা আজ্‌গৈবী অজ (থেকে) গৈয়ব (অদৃশ্য)। আজ্‌গৈবী মানে যা অদৃশ্য থেকে। এর থেকে অর্থ হয়েছে অভাবনীয়, অদ্ভুত। আজগুবি ইচ্ছে, আজগবি কল্পনা।

ঈদ

'ঈদ' শব্দটি মূল অর্থ যা ফিরে ফিরে আসে। এর থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে মুসলমানদের পালনীয় বার্ষিক উৎসব বিশেষ।

ঈদুজ্জোহা

মূল কথাটি ঈদ-উল্‌-আজহা। আজহা মানে পূর্বাহ্নের উৎসর্গ। ঈদ-উল-আজহা মানে, উৎসর্গের ঈদ বা বকর ঈদ। এই ঈদে ছাগ মেষ গোরু উট প্রভৃতি কোরবানি (উৎসর্গ) করা হয় হজরত ইব্রাহিমের বিখ্যাত কোরবানি স্মরণে।

হিজরী সনে জিলহজ মাসের দশম দিনে এই উৎসব পালিত হয়।

ঈদুল্‌ ফিতর

ঈদ্‌-উল-ফিৎর্‌ মানে 'দানের ঈদ'। রমজান মাসের উপবাসান্তে মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত উৎসব। প্রভাতে মুসলমানেরা মসজিদ বা ময়দানে সমবেত

হয়ে প্রার্থনা জানায়, পরে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানায় । দরিদ্র ব্যক্তিদের কিছু দান করা এ উৎসবের অবশ্য কর্তব্য ।

এই দানকে ফিত্‌রা বলে । এর থেকেই এই ঈদের নাম ঈদুল-ফিতর্‌ ।

উর্দু

উর্দু কথাটি তুর্কী । মূল অর্থ সৈন্যশিবির । কথাটা ছিল জবান-ই-উর্দু অর্থাৎ উর্দু-ভাষা । সংক্ষিপ্ত হয়ে তা শুধু 'উর্দু'তে দাঁড়িয়েছে । চতুর্দশ শতকে প্রধানত দিল্লীতে এবং তারপর অন্যত্র এই ভাষার চল হয় । উর্দুকে আরবী-ফার্সী প্রভাবিত হিন্দুস্থানী বলা চলে ।

কারচুপি

মূল শব্দটি ফার্সী- 'কারচোব'– কাপড়ে নকশার কাজ । তার থেকে দাঁড়িয়েছে কূট- কৌশল ।

'চোব্‌' শব্দটা বাংলায় 'চুপ' (চুপি) হয়েছে ধ্বনি সামঞ্জস্যে । একে বলে লোকনিরুক্তি ।

কাহিল

আরবী 'কাহিল' শব্দের অর্থ অলস । আলস্যের সঙ্গে অবসাদ বা দুর্বলতার একটা সম্পর্ক আছে । তাই কাহিল মানে 'অলস' থেকে রূপান্তরিত হয়েছে দুর্বল বা অবসন্ন বোঝাতে । শোচনীয় বোঝাতেও 'কাহিল' শব্দের প্রয়োগ আছে : অবস্থা কাহিল ।

কুলুপ

আরবী কুফ্‌ল্‌ মানে তালা । উচ্চারণবিভ্রান্তিতে কুফ্‌ল্‌ হয়ে উঠল কুল্‌ফ্‌ । একে বলা হয় বর্ণ-বিপর্যয় । মূলের ফ্‌ আর ল্‌ ব্যঞ্জন স্থান পরিবর্তন করে হল লুফ্‌ । এরপর যুগ্মবর্ণের মাঝখানে এলো উ-স্বরবর্ণ । কুল্‌ফ্‌ হল কুলুফ্‌ । আরও সহজ উচ্চারণ, 'কুলুফ' হল কুলুপ ।

কেতাদুরস্ত

আরবী 'ক.তা' মানে কায়দা বা চালচলন । 'ক.তা' উচ্চারণে হয়েছে 'কেতা'– মিছে কথার কী 'কেতা' ।

ফার্সী দ্রুস্ত্ মানে চৌকস, দক্ষ, নিখুঁত । এই দ্রুস্ত্ বাংলা উচ্চারণে হয়েছে দুরস্ত । কেতাদুরস্ত মানে হল চালচলনে যে নিখুঁত ।

খরগোশ

ফার্সী 'খর' মানে গাধা । গাধার কান বড়োবড়ো । শশকের কান বড়ো বলে তাই তার নাম খরগোশ অর্থাৎ খরের (গাধার) মতো গোশ (কান) যার = খরগোশ ।

খয়ের খাঁ

ফার্সী খয়ের । বাংলা উচ্চারণে দাঁড়িয়েছে খরের খাঁ । লোকনিরুক্তির একটি উদাহরণ । খয়ের = মঙ্গল । খোয়াহ্ মানে– কামনাকারী । খয়ের খোয়াহ্ র মূল অর্থ মঙ্গলকামী । বাংলায় খোশামুদে অর্থে চালু ।

খাতা

আরবী খত্ মানে লেখা । ফার্সী 'হা' বহুবচন বোঝায় । দুটি শব্দ মিলে হল খৎহা । অর্থাৎ লেখাসমূহ । দ্রুত উচ্চারণে খৎহা হয়ে গেল খাতা । অর্থ দাঁড়ালো লেখাসমূহ সম্বলিত বাঁধাকাগজ ।

খোসামোদ

ফার্সী 'খুশ' মানে 'শুভ', আর 'আমদ' মানে আগমন । মূলগত অর্থ শুভাগমন, বা স্বাগত । অতিথি এলে বলা হত 'খুশামোদ' অর্থাৎ স্বাগত বা আসুন আসুন । এর থেকে স্বাগত সম্ভাষণে অত্যন্ত গদগদ ভাব থেকে অর্থ হয়েছে চাটুকারিতা ।

চরখা

ফার্সী চর্খা মানে চক্র । চক্রযুক্ত যে বিশেষ যন্ত্রে সুতো কাটা হয় তার নাম হয়েছিল চরখা বা চরকা ।

চরকি বা চর্কি শব্দটিও চরকা থেকেই এসেছে । চরকিবাজী– । লাটাইও নাম পেয়েছ চরকি, ঘোরাতে হয় বলে ।

চশমা

ফার্সী চশম্ মানে চোখ। দৃষ্টিশক্তি বাড়াবার জন্যে চোখে লাগাবার বিশেষ উপকরণটির নাম হয়েছে চশমা।

সাধুভাষায় 'চশমা'কে 'উপনেত্র' বলে।

চাঁদা

কোনো কাজে বহুজনের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করার নাম হয়ে গেছে চাঁদা। কথাটির উৎস ফার্সী চন্দহ্ = কিছু, চন্দহ বা চাঁদা = কিছুকিছু সংগ্রহ।

জানোয়ার

ফার্সী জান = প্রাণ। জান আছে যার সে জান+ওয়ার = জানোয়ার = প্রাণী। তুলনীয় জন্তু। জন্+তু। যে জন্মগ্রহণ করেছে সেই জন্তু। জাত মাত্রই অবশ্য ঐ নামে চিহ্নিত হয় নাই, শুধু পশুই ঐ নামে চিহ্নিত। জানোয়ারের বেলাতেও একই রূপ।

জ্বালাতন

আরবী জলা মানে নির্বাসন। ওয়তন মানে দেশ। কথাটির মূল অর্থ দেশ থেকে অন্যত্র নির্বাসন। এই স্বদেশ-ভ্রষ্টতা অত্যন্ত দুঃখদায়ক। তাই জ্বালাতন মানে দাঁড়িয়েছে পীড়ন।

জেরবার

ফার্সী জের মানে নীচে। 'বার' মানে বোঝা। 'জেরবার' মানে বোঝার নীচে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত বা নাকাল। মকদ্দমায় মকদ্দমায় জেরবার হয়ে গেল রহিমভাই।

তুলকালাম

আরবী তূল = বিস্তার। আর আরবী কালাম = কথা। তূল-ই-কালাম মানে বাগ্‌বিস্তার, তার থেকে কথা কাটাকাটি, তার থেকে হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামেচি। তূল-ই-কালাম কথাটাই সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে তুলকালাম।

নিমরাজী

আরবী রাজী মানে সম্মত বা ইচ্ছুক। ফাঃ নিম মানে অর্ধ। নিমরাজী মানে কিছুটা রাজী। সংস্কৃতে 'নেম' মানেও অর্ধ।

দস্তখত

ফার্সী দশ্‌ৎ মানে হাত। খত্‌ মানে লেখা। 'দস্তখত' মানে হস্তাক্ষর–Signature.

দহরম-মহরম

মূল ফার্সী দরহম বরহম বর্ণ বিপর্যয়ে তা হয়েছে দহরম মহরম। অর্থ ঘনিষ্টতা, অন্তরঙ্গতা বা মাখামাখি।

'মরহম' শব্দ 'মহরম' হয়ে ওঠার কারণ আরবী মহরম মানে অন্তরঙ্গ। ফলে সহচর শব্দটিও দহরম হয়ে উঠেছে।

নাজেহাল

আরবী নজা মানে মৃত্যুযন্ত্রণা, হাল = অবস্থা। নাজেহাল মানে মৃত্যুযন্ত্রণার অবস্থা অর্থাৎ একেবারে অতি দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা।

বাউণ্ডুলে ছেলেটা বাপমাকে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ল।

নামাজ

মূল ফার্সী নমাজ। মুসলমান মতে উপাসনা (পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ)। সংস্কৃত 'নমস্‌' শব্দের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো।

নাস্তানাবুদ

ফার্সী 'নীস্ত্‌ ওয়্‌ নাবূদ' থেকে এসেছে শব্দটি। 'নীস্ত' মানে নাই, 'নাবুদ' মানে যা ছিল না। যা নাই বা ছিলও না, অর্থাৎ অবর্ণনীয় দুর্দশা। মালিকের হুকুম তামিল করতে গিয়ে বেচারা একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে।

নিমকি

আরবী নমক বা নিমক মানে লবণ। নিমকি মানে নোন্‌তা। তার থেকে বিশেষ একটি নোন্‌তা খাবার।

পরী

ফার্সী 'পর' মানে পাখা। 'পরী' মানে যার পাখা আছে। স্বর্গীয় অপ্সরা বা fairy বোঝাতে ব্যবহৃত।

পাপোষ

ফার্সী 'পোশ' মানে পায়ের আবরক বস্তু, অর্থাৎ জুতা। তার থেকে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে মানে দাঁড়িয়েছে জুতো মোছবার বস্তু অর্থাৎ জুতার ধূলা ঝাড়বার জন্যে বিছানো অস্তরণ। পা-পোষের এই অর্থ পরিবর্তনে বাংলা পা-পোঁছ্ শব্দের প্রভাব থাকতে পারে।

পুস্তক

'পোস্‌ৎ' প্রাচীন পারসিক শব্দ, মানে ভেড়ার চামড়া (পার্চমেন্ট)।

তাতেই বইলেখা হত বলে পোস্ত্ মানেই বই হয়ে উঠল। আমাদের দেশে শব্দটি এল 'পুস্ত' হয়ে, পুস্ত থেকে পুস্তক। স্ত্রীলিঙ্গে পুস্তিকা। তাই থেকে পুথি, পুঁথি।

প্যাঁচ

ফার্সী 'পেচ' শব্দটি বাংলা উচ্চারণ প্যাঁচ দাঁড়িয়েছে। পেচ মানে কূটবুদ্ধি।

পুঁথি

'পুস্তক' দ্রষ্টব্য।

ফতে

'ফতে' এসেছে ফার্সী 'ফতেহ্' শব্দ থেকে। ফতেহ মানে বিজয়, বাংলায় অর্থ হয়েছে হাসিল, সিদ্ধ। কাজ ফতে = কাজ হাসিল।

'ফতেপুর' অর্থ যে পুর বা নগর বিজয়ের স্মারক হিসেবে নির্মিত হয়েছিল।

ফাজিল

আরবী ফাজিল মানে মুসলিম শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। কিন্তু শব্দটি অর্থের অপকর্ষ ঘটেছে। ফাজিল মানে দাঁড়িয়েছে বাচাল বা বকাটে। বিশেষ্য হিসেবে গড়ে উঠেছে ফাজলামি বা ফাজলামো।

ফিরিস্তি

মূল ফার্সী ফিহ্‌রিস্ত, অর্থ তালিকা বা ফর্দ।

ফেরেবাজ

ফার্সী ফরেব = প্রতারণা, শঠতা, জুয়াচুরি, ফরেববাজ মানে প্রতারক, শঠ, জেচ্চোর। 'ফেরোবাজী' মানে প্রতারণা বা 'জোচ্চুরি'।

এসব ফেরেববাজী এখানে চলবে না।

বন্দোবস্ত

ফার্সী বন্দ্‌ ও বস্ত্‌ আসলে প্রায় সমার্থক। মানে বাঁধাবাঁধি কিছু। তার থেকে অর্থ হয়েছে শৃঙ্খলা,. পরিপাটি, ব্যবস্থা বা আয়োজন।

বরকন্দাজ

ফার্সী শব্দ ঃ বর্‌ক্‌ = গুলি, আন্দাজ = নিক্ষেপকারী। বরকন্দাজ মানে গুলিনিক্ষেপকারী। সিপাহী। পরে অর্থ দাঁড়িয়েছে প্রহরী বা চাপরাশী।

বাজখাঁই

খাদের বা চাপাগলার অস্বাভাবিক সুর বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার। বাজ বাহাদুর খাঁ এই পদ্ধতির প্রবর্তক। তিনি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে মালআ-দেশে রাজ্য করতেন।

বাজেআপ্ত

বাজ = পুনরায়। ইয়াফ্‌ৎ = প্রাপ্ত। অর্থ ঃ মালিক বা সরকার কর্তৃক পুনরধিকৃত। সনদ বা দলিলের অভাবে মালিক কর্তৃক অধিকৃত (confiscated)।

বাবরী

ফার্সী 'বাবর' মানে সিংহ। বাবরী মানে সিংহের ন্যায়>সিংহের কেশরের মতো। বাবরী চুল।

বাহবা

ফার্সী ওয়াহ্ ওয়াহ্ ! প্রশংসাসূচক ধ্বনি । তার থেকে বাহবা । বি. শব্দের অন্তঃস্থ 'ব' বাংলার বর্গীয় 'ব' হয়ে ওঠে ।

বাবুর্চী

মূল 'বাওয়র্চী' শব্দটি ফার্সী ও তুর্কীর সংকর । ফার্সী 'বাওয়র্' মানে বিশ্বাস, তুর্কী 'চী' মানে বাহক বা ধারক (যেমন মুশালচী) বাওর্চী মানে যে বিশ্বাসের বাহক বা ধারক অর্থাৎ বিশ্বাসী ।

যে বিশ্বাসী অফিসার প্রভুর খাবাবের টেবিলে উপস্থিত হত, এবং প্রভুর আহারের আগে খাবার পরখ করে দিত তাকে বাওয়র্চী বলা হত । এর থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'পাচক' ।

বালাই

ফার্সী 'বলা' মানে 'অমঙ্গল' । বাংলায় এই 'বলা' হয়েছে বালাই ।

বারোয়ারী

বারহ্ + ইয়ার (বন্ধু) = বারোয়ার + ঈ = বারোয়ারী, বারো বন্ধু মিলে যা করা হয় । পরে অর্থ দাঁড়িয়েছে সর্বজনীন ।

বেকুব

মূল শব্দ 'বেওকুব' । ফার্সী বেওয়াকিফ অর্থ বে-খবর, ঠিক সংবাদ যে জানে না । 'বেওকুফ' উচ্চারণে হয়েছে বেওকুব বা বেকুব । অর্থের অবনতি ঘটেছে শব্দটার, অর্থ দাঁড়িয়েছে 'বোকা' ।

মকশো

ফার্সী 'মশ্‌ক' শব্দ বর্ণবিপর্যয়ের ফলে হয়ে উঠেছে 'মকশো' । প্রথম শিক্ষার্থীর সযত্ন অভ্যাস বা লেখার উপর লিখে লিখে লেখা শেখা ।

মক্তব

আরবী শব্দ। মূল অর্থ যেখানে লেখা-পড়া শেখানো হয়। মূল ধাতু 'কত্‌ব্‌ = লেখা। মুসলমান শিক্ষার্থীদের পাঠশালা বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার হয়। মক্তব-মাদ্রাসা।

মঞ্জুর

আরবী শব্দ। মূল অর্থ 'যাতে নজর দেওয়া হয়েছে'। লাক্ষণিক অর্থ 'অনুমোদিত'।

মসজিদ

আরবী 'মসজিদ' কথাটির মূল অর্থ যেখানে 'সেজ্‌দা' দেওয়া হয়। সেজ্‌দা মানে নতি, নিবেদন। মসজিদ মানে এই নতি নিবেদনের স্থান অর্থাৎ উপাসনালয়। ইসলাম ধর্মের মতে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কাউকে সেজ্‌দা করা যায় না।

মশগুল

আরবী 'শগল' মানে কাজকর্ম। মশগুল শব্দটির মূল অর্থ কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, এর থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে বিভোর, আবিষ্ট, তন্ময়। গান-বাজনায় মশগুল হয়ে আছে।

মাতব্বর

মূল আরবী 'মুআতবর'। শব্দটির মূল 'এতবার'– মানে বিশ্বাস থেকে। মুআতবর মানে বিশ্বসনীয়, বিশ্বস্ত। তার থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে, মান্য বা প্রধান।

বাংলায় অর্থের অপকর্ষ ঘটেছে। কেউ অকারণে কর্তৃত্ব ফলাতে গেলে বা মুরুব্বীর মতো আচরণ করতে গেলে বলা হয় 'মস্ত মাতব্বর হয়েছিস দেখছি। এসব মাতব্বরি এখানে চলবে না'।

মুনসিফ

আরবী ইন্‌সাফ মানে সুবিচার। যে ইন্‌সাফ করে সে 'মুনসিফ'। অবশ্য সর্বসাধারণের বিচারকই মুনসিফ নয়, এখন দেওয়ানি আদালতের নিম্নতম বিচারকর্তাকে মুনসিফ বা মুনসেফ বলে।

রসুলুল্লাহ

আরবী 'রসুল' মানে প্রেরিত পুরুষ। রসুলউল্লাহ্ বা রসুল-ই-খুদা বা রসুল-ই-করিম মানে ঈশ্বরের দূত, অর্থাৎ হজরত মুহম্মদ।

রুমাল

ফার্সী 'রূ' মানে মুখ। 'মাল' মানে মোছে যা। 'রুমাল' মানে 'যা মুখ মুছে দেয়'। আসলে 'মাল' মানে মোছো, মুছে দাও। এটি অনুজ্ঞা-পদ। কিন্তু সমাসবদ্ধ পদের পরে থাকায় অনুজ্ঞা না বুঝিয়ে কর্তৃবাচক তদ্ধিত প্রত্যয়ের কাজ করছে।

সঙ্গীন

ফার্সী 'সঙ্গ' মানে প্রস্তর বা পাথর। সঙ্গীন মানে প্রস্তরময় অর্থাৎ কঠিন, বা আশঙ্কাজনক। অবস্থা সঙ্গীন।

সাগরেদ

ফার্সী 'শাগিদ' মানে শিষ্য বা ছাত্র। 'শাগির্দ' বাংলায় হয়েছে সাগরেদ বা সাকরেদ। প্রয়োগে অর্থের অপকর্ষ ঘটেছে, এখন খারাপ কাজের সঙ্গী অর্থেও ব্যবহার হয়।

সেতার

ফার্সী 'সে' (সেহং) মানে তিন। তিন তারের বিশেষ একটি যন্ত্রের নাম ছিল সেতার। এখন যন্ত্রটির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে ; এখন এটি বহু তারের যন্ত্র। কিন্তু প্রাচীন নামটি রয়ে গিয়েছে।

হদিস

'হদিস' এসেছে 'হাদিস' থেকে। আরবী 'হাদিস' হচ্ছে বিশ্বনবী হজরত মুহম্মদের বাণী। জীবনযাত্রার বহু ব্যবহারে হাদিসের নির্দেশ পরম আদৃত। এর থেকে 'হদিস' মানে 'পথ', সন্ধান বা উপায়, খোঁজ খবর।

হাফিজ

আরবী 'হাফিজ' মানে রক্ষক বা রক্ষাকারী। বিদায় কালে বলা হয় 'খোদা হাফিজ' অর্থ ঈশ্বরই রক্ষাকর্তা।

সমগ্র কোরান যাঁর কন্ঠস্থ তাকে 'হাফিজ' বলা হয় । এখানেও 'রক্ষক' অর্থ বজায় আছে । সমগ্র কোরানকে যিনি হৃদয়ে রক্ষা করেন তিনিই হাফিজ ।

হিন্দু

শব্দটি সংস্কৃত নয়, তাই সংস্কৃত মতে এর ব্যুৎপত্তি হবে না । হিন্দু শব্দটি ফার্সী ।– মূল অর্থ 'হিন্দ্' এর অধিবাসী অর্থাৎ ভারতবাসী । এখন বোঝায় 'সম্প্রদায় বিশেষ' ।

হিল্লে

আরবী 'হীলাহ্' বাংলা উচ্চারণে হিল্লে হয়েছে । মানে আশ্রয় বা অবলম্বন, বা সুব্যবস্থা । ছেলেটার চাকরি হলে তবু একটা হিল্লে হয় ।

হুবহু

আরবী হুয়া-ব-হুয়া অর্থাৎ সে এবং সে । অর্থাৎ 'সে' বা তা ছাড়া কিছু না । এই শব্দ থেকে 'হুবহু' মানে দাঁড়িয়েছে 'অবিকৃত' । হুবহু নকল করেছে ।

হেস্তনেস্ত

ফার্সী হস্ত ও নীস্ত বাংলা উচ্চারণে হয়েছে 'হেস্ত নেস্ত' । হস্ত মানে আছে,নীস্ত মানে নেই । আছে বা নেই, থাকা বা না-থাকা – যা হোক একটা কিছু । চরম বোঝাপড়া । এর একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়ব ।

আন্দাজ

ফার্সী 'আন্দাজ' শব্দটির মূল অর্থ 'মাপ', তার থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে অনুমান । 'মাপ' আর 'মান' অর্থের দিক থেকে দূরবর্তী নয় ।

আবরু

ফার্সী 'আবরু' মানে 'সম্মান' বা সম্ভ্রম । তার থেকে মানে দাঁড়ালো সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্যে যা দরকার । এর ফলে আবরুর মানে হল পর্দা ।

আবাদ

ফার্সী 'আবাদ' মানে যা কর্ষিত বা চষা । এর থেকে বাংলায় অর্থ দাঁড়ালো কৃষি বা চাষ করা । এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা । এখানে আবাদ করা মানে চাষ করা ।

আবির

আরবী 'অবীর' মানে সুগন্ধ। বাংলায় হোলি-উৎসবে ব্যবহৃত সুগন্ধ চূর্ণ বিশেষ।

আব্বা

আরবী 'অব' মানে পিতা। বর্ণদ্বিত্বে ও ফার্সী 'বাবা' শব্দের প্রভাবে 'অব' হয়েছে 'আব্বা'।

আশকারা

আরবী 'আশকারা' মানে স্পষ্ট বা প্রমাণিত। আক্ষরিক অর্থের 'আশকারা' দেওয়ার মানে স্পষ্ট করে তোলা বা প্রমাণিত বলে ধরা। কাউকে একটু বেশি স্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং তার যে-কোনো আচরণকেই মেনে নেওয়ার অর্থ দাঁড়িয়েছে এর থেকে। আশকারা দিয়ে ছেলেটাকে মাথায় তুলেছে এরা।

আসর

আরবী 'অসর' মানে বৈকালীন প্রার্থনা, তার থেকে মানে দাঁড়ালো বৈকালীন অধিবেশন, তারপর যে কোনো অধিবেশন বা বৈঠক। এখানে ঘটেছে শব্দার্থের অপকর্ষ।

কানাঘোষা, কানাঘুষা, কানাঘুষো

বাংলা 'কান' আর ফার্সী কান-বাচক 'গোশা' শব্দ মিলে তৈরি। 'কানগোশা' হল 'কানাগোশা' যার মানে 'কানাকানি'। মূলের ফার্সী 'গোশা' বাংলায় হয়ে উঠল 'ঘোষ'। লোকেমুখে এমনটি হয়ে থাকে।

কারবার

ফার্সী 'কার' ও 'বার' একসঙ্গে জুড়ে কারবার। 'কার' মানে কাজ আর 'বার' মানে 'ভার' বা দায়িত্ব। 'কারবার' মানে কাজকর্ম বা কাজের ভার, তার থেকে ব্যবসায়।

কারদানী, কেরদানী

ফার্সী 'কারদানী' মানে কাজকে জানা, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা। এর থেকে মানে দাঁড়ালো কর্মকৌশল, তা থেকে কৌশল বা কায়দা। 'কারদানী' একটু ব্যঙ্গের ছোঁয়া লেগে হয়ে উঠল কেরদানী। থাক থাক আর কেরদানী দেখাতে হবে না।

কেল্লা ফতে

আরবী কিলা = দুর্গ আর ফত্‌হ = বিজয়, এই দুটি শব্দ মিলে বাংলায় হয়েছে 'কেল্লাফতে' অর্থাৎ দুর্গজয় হয়েছে। আলংকারিক অর্থে, ঈপ্সিত সাফল্য বা দুর্লভ সাফল্য।

খামখেয়াল

ফার্সী 'খাম' মানে কাঁচা বা অপরিণত। খামখেয়াল মানে যে ভাবনা অপরিণত। বা অব্যবহিত। এর থেকে খামখেয়ালি বা খাম খেয়ালিপনা। এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে কি খামখেয়ালি চলে?

গোয়েন্দা

ফার্সী 'গোয়েন্দা' শব্দটির মূল অর্থ যে বলছে। এর থেকে মানে দাঁড়িয়েছে যে গোপন কথা জেনে এসে বলছে, অর্থাৎ স্পাই।

চশমখোর

ফার্সী চশমখোর মানে যে চোখ খেয়েছে, অর্থাৎ চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়েছে অর্থাৎ নির্লজ্জ – কুকর্মে যার লজ্জা নেই।

চৌবাচ্চা

ফার্সী 'চাহ বচ্চহ' বাংলায় হয়েছে চৌবাচ্চা। 'চাহ্‌' মানে কুয়ো। বাচ্চা মানে 'ছোটো'। অর্থাৎ ছোটো কুয়ো এর থেকে মানে দাঁড়ালো ইট দিয়ে তৈরি চৌকোণা জলাধার।

জঙ্গী

ফার্সী 'জঙ্' মানে যুদ্ধ। জঙ্গী মানে যুদ্ধে যে সামিল। আলংকারিক অর্থে সৈনিকোচিত, মারমুখী বা উগ্র। এমন জঙ্গী মনোভাব নিয়ে আপোষ আলোচনায় বসবে কী করে?

জমজমাট

আরবী 'জম' মানে মিলন, 'জামাত' মানেও তাই, দুটো শব্দ মিলিত হল মিলনের অর্থটাকে জোরালো করতে। 'জমজমাত্‌' হয়ে গেল 'জমজমাট'। ভালোভালো শিল্পীদের সমাবেশে আসর একেবারে জমজমাট।

জারী

ফার্সী 'জারী' মানে 'বিলাপ'। কারবালার করুণ কাহিনী নিয়ে রচিত গানের নাম তাই হল 'জারী'।

জোলাপ

ফার্সী 'গুলাব্' (গোলাপ) আরবীতে হল 'জুলাব', 'গোলাপজল' বোঝাতে। পর্তুগিজ শব্দ (জলাপ্) শব্দের প্রভাবে তা হল জোলাপ। গোলাপ জলের অর্থ আর রইল না, মানে দাঁড়ালো কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জিনিস, এক কথায় রেচক।

তছনছ

আরবী 'নহ্স্' মানে দুর্যোগ বা সংকট। 'তহ্স' অনুকার জাত শব্দ। দুইয়ে মিলে 'তহসনহস' অর্থাৎ ভয়ংকর ঝঞ্ঝাট, ওলোটপাল্‌ট, ধ্বংস। তহ্স্‌নহস্ বাংলায় হল 'তসনস্' তার থেকে 'তছনছ'।

তরজা

আরবী 'তরজু' বা 'তরজি' মানে ফিরিয়ে দেওয়া। একজনের বক্তব্য ফিরিয়ে দেওয়া হয় এমন যে গান অর্থাৎ উতোর চাপান নিয়ে যে গান তাকে বলে 'তরজা'।

নাকচ

আরবী 'নাকিস্' মানে ত্রুটিপূর্ণ। বাংলা 'নাকিস' হল 'নাকচ'। ত্রুটিপূর্ণ জিনিস বাতিল করার অর্থ বয়ে আনল শব্দটি। তোমার প্রস্তাব যে এমন করে নাকচ করে দেবে ভাবি নি।

নাচার

ফার্সী নাচার = নাই চারহ্ (উপায়) যার। অর্থাৎ নিরুপায়। বাংলায় ওই অর্থই বজায় থাকল। তবে বিশেষণ বিশেষ্য দুই পদ হিসেবেই চলে শব্দটি। আমার এ প্রস্তাবও যদি তুমি না মান তবে আমি নাচার (বিশেষণ)। কী করব, বড়ো নাচারে (বিশেষ্য) পড়ে গেছি।

নালিশ

ফার্সী 'নালিশ' মানে বিলাপ। তার থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে অভিযোগ করা। নালিশ করে কিছুই লাভ হল না।

পই পই

ফার্সী পায়্-দর-পায় বা পায়-আ-পায় মানে ক্রমন্বয়ে আসা। তার থেকে অর্থ দাঁড়ালো বারবার। তোকে পই পই করে বারণ করলাম শুনলি নে, এখন তার ফল ভোগ কর্ ।

ফচকে

আরবী 'ফিস্‌কে' মানে দুশ্চরিত্র। এই শব্দের সঙ্গে বাংলায় 'ইয়া' প্রত্যয় যোগ করে নিয়ে হল 'ফিস্‌কিসা', তার থেকে 'ফিসকে', ফিসকে হল 'ফচকে' অর্থাৎ বখাটে।

বজায়

ফার্সী 'ব-জায়' মানে 'জায়গা মতো'। 'আমার আবদার বজায় আছে' মানে আমার আবদার অক্ষুণ্ণ আছে। ফার্সী 'ব' = সহিত। 'জা > জায় = জায়গা। আক্ষরিত অর্থে 'জায়গার সহিত' অর্থাৎ 'জায়গামতো'।

বদলা

আরবী 'বদলা' শব্দের মূল অর্থ ছিল বিনিময়। তার থেকে অর্থ দাঁড়ালো প্রতিশোধ। 'বদলা' না নিয়ে ওরা ছাড়বে না।

বরখাস্ত

ফার্সী বর্‌খাস্ত মানে ভঙ্গ। তার থেকে 'পরিত্যক্ত'। এখন মানে দাঁড়িয়েছে ছাঁটাই করা (dismiss)। তোমাকে বরখাস্ত করা হল।

বায়নাক্কা

আরবী 'বয়ান' মানে বিবরণ, আর ওয়াকিয়া মানে 'ঘটনা'। বয়ান-ই-ওয়াকিয়া ঘটনার বিবরণ। এই বয়ান-ই-ওয়াকিয়া উচ্চারণে দাঁড়িয়েছে বায়নাক্কা। শব্দটির অর্থ বদলেছে, একের পর একটি অন্যায় আবদার বোঝাতে এখন 'বায়নাক্কা' শব্দটি চলে।

বীমা

ফার্সী 'বীমহ্' মানে ভয়। বীমহ্ = ভয় পেয়ে যে চুক্তি করা হয়। কিসের ভয়-? মৃত্যুর ভয়। যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে আমার পরিবার যাতে দুরবস্থায় না পড়ে এমন আর্থিক চুক্তি। এখন 'জীবন' কথাটা 'বীমা'র আগে যুক্ত হয়।

বিলাত

আরবী 'ওলায়ত্' বাংলা উচ্চারণে 'বিলাত' হয়েছে। মুসলিম আমলে বিলাত বলতে বোঝাত পারস্য ও মধ্য এশিয়া, পরে গ্রেটব্রিটেনকে বোঝালো ইংরেজ আমলে।

বেদুইন

'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'। আরবী যাযাবর-বাচক বদয়াইয়্যিন্' থেকে 'বেদুইন' এসেছে। সরাসরি আরবী থেকে আসে নি এসেছে ঐ শব্দটির ফরাসী বানান bedowin থেকে।

সয়লাব, ছয়লাপ

আরবী 'সয়েল' মানে প্রবাহ। ফার্সী 'আব্' মানে জল। 'সয়েলাব' মানে প্লাবিত। এর থেকে অর্থ দাঁড়ালো পরিব্যাপ্ত বা পরিপূর্ণ। জুড়িগাড়িতে ছয়লাপ।-

শিরোপা

ফার্সী 'সর-ও-পা' থেকে কথাটি এসেছে। 'সর-ও-পা' মানে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। এর থেকে অর্থ হয়েছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিধেয়- আশা, পাগড়ি, পাজামা, পটকা দুপাট্টা- যা রাজদরবারে সম্মান দেখানোর জন্যে দেওয়া হয়। এর থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে পারিতোষিক। 'যশের শিরোপা শিরে ধর'। - দেবেন্দ্রনাথ সেন।

বন্ধুশব্দ ঃ আরও কিছু

গঞ্জি বা গেঞ্জি

এই বহুল-প্রচলিত পরিচ্ছদটির নাম এসেছে ইংলিশ চ্যানেলের Guernsey দ্বীপের নাম থেকে। এই দ্বীপেই এই পরিচ্ছদটি তৈরি হত একদিন। পশমে বা সুতোয় বোনা আঁটো জামা বোঝাতে এই শব্দটি চালু ছিল।

জার্সি

গেঞ্জির মতো জার্সিও তৈরি হত ইংলিশ চ্যানেলের Jersey নামে সবচেয়ে বড়ো দ্বীপে। এও ছিল আঁটোজামা, নাবিকেরা পরত প্রধানত। খেলার বিশেষ দলের পরিধেয় জামাকে এখন জার্সি বলা হয়।

ক্যাঙারু

অস্ট্রেলিয়ার এই বিশেষ ভঙ্গীতে লাফিয়ে চলা জন্তুটি আমাদের সবারই চেনা। একজন ভ্রমণকারী বনের মধ্যে এই জন্তুটিকে দেখে আদিবাসীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটি কী জন্তু। আদিবাসী উত্তরে বলেছিল, 'কাং গা রু', অর্থাৎ আমি জানি না। ভ্রমণকারী তাঁর কথাটিকে জন্তুটির নাম ভেবে নিলেন। চালু হয়ে গেল ওই নামটি।

জুজুৎসু বা জুজিৎসু

শব্দটি জাপানী। জুজুৎসু জাপানের একটি বিশিষ্ট রণকৌশল। অন্যের দেহ-ভার বা শক্তিকে নিজের কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষকে বশে আনা এই কৌশলের মূল কথা। 'জু' মানে মৃদু আর 'জুৎসু' মানে 'কৌশল'। অর্থাৎ জুজুৎসু মানে মৃদু-কৌশল। তেমন জানান না দিয়েও এই কৌশলটি কাজের কাজটি করতে পারে, তাই এর এই নাম।

সংস্কৃত 'যুযুৎসু' বলে একটি শব্দ আছে, তার সঙ্গে এই জুজুৎসু-র কোনো সম্পর্ক নেই। সংস্কৃত 'যুযুৎসু' মানে 'যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক'।

নাৎসি

'নাৎসি' জার্মান শব্দ। সতেরোটি হরফের বড়ো একটি শব্দকে ছোট্ট করে নিয়ে এই শব্দটি তৈরি হয়েছে। মূল কথাটি হল NATIONAL SOZIALIST (ঃ নাট্‌সিয়েনাল জোট্‌সিয়ালিষ্ট্)। এটি হল National Socialist Workers' party. ১৯৩৩ সালে এই পার্টি ক্ষমতা এসেছিল হিট্‌লারের নেতৃত্বে।

ফ্যাসিষ্ট

শব্দটি ইতালীয়। ইতালীর উগ্রজাতীয়তাবাদী, কম্যুনিষ্টবিরোধী বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসীদের ঐ-নামে চিহ্নিত করা হত। এই শব্দের লাতিন মূল হল fascis (ফাসিস), যার মানে bundle বা বাণ্ডিল। মানে দাঁড়ালো যারা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দলবদ্ধ।

সাম্পান

'সাম্পান' চীনের একরকম হালকা নৌকা। কথাটার মধ্যে আছে দুটো শব্দ SAN আর pan. 'সান্' মানে 'তিন', আর পান্ মানে 'পাটাতন'। দুটো মিলে 'সান্‌বান্'। একসঙ্গে উচ্চারণে সাম্পান।

চা

বিশ্বজোড়া ফাঁদ-পাতা শুক্‌নোপাতার উষ্ণ পানীয়টি প্রথমে চালু হয় চীনে। হিমালয় পেরিয়ে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন এসে পৌছুলেন তখন তাকে যে রক্তাভ পানীয় দেওয়া হয়েছিল তাতে তার পথের ক্লান্তি দূর হয়েছিল। বাঙালীর এই প্রথম চা-পান্। একই জিনিস চীনে দু-ভাবে উচ্চারণ করা হয়। 'তে' বা 'তা'। সমুদ্র-উপকূলের এই উচ্চারণ 'টে' বা 'টী' হয়ে পাড়ি দিল ইউরোপ আমেরিকায়। মধ্যচীনে উচ্চারণটা ছিল ৎসা (tsa)। এই উচ্চারণ, 'চা' হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।

বাটিক

শব্দটি এসেছে জাভা থেকে। বাটিক হল বিশেষভাবে রঙ করা বা ছাপানোর পদ্ধতি। এর মানে হল 'চিত্রিত'। সংস্কৃতের 'বর্তিক' শব্দটা থেকে বাটিক হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়, বর্তিক মানে 'বর্ণভাণ্ড'। সে-ক্ষেত্রে, শব্দটা ভারত থেকেও জাভায় যেতে পারে। 'বাটিক' বলতে এখন আমরা যা বুঝি বিশেষজ্ঞরা বলেন সে ধরনের শিল্প প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল।

রিক্সা

'জিন্-রিকি-শ' এই মূল শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হল 'রিক্সা'। জাপানী 'জিন্' মানে মানুষ, 'রিকি' মানে শক্তি আর 'শ' মানে শকট। সম্পূর্ণ শব্দটির অর্থ মানুষ-শক্তি-শকট।

প্রতিশব্দে কত কথা

ভাস্কর, মার্তণ্ড, দিননাথ, সবিতা, বিভাবসু, তপন, ধ্বান্তারি, হরিপদ, চিত্ররথ, কমলিনীনায়ক, সপ্তাশ্ব – এগুলি সূর্যের প্রতিশব্দ। এই সব শব্দগুলি বিশ্লেষণ করলে সূর্যের গুণ ধর্ম ইত্যাদির পরিচয় ফুটে উঠবে, এক কথায় মানুষ সূর্যকে কী চোখে দেখেছে, তার পরিচয় মিলবে এইসব প্রতিশব্দে। এই পরিচ্ছেদে আমরা এই ধরনের প্রতিশব্দ বিশ্লেষণ করব, তাতে বোঝা যাবে প্রতিশব্দ কত কথাই বলে।

প্রতিশব্দ মনে রাখার জন্যে– যেগুলো ছন্দে বেঁধে দেওয়া হত। অমর-কোষ এই ধরনের একটি অভিধান।

প্রতিশব্দ জানা থাকলে প্রয়োজনমতো তা কবিতাদি রচনায় প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। আমরা যেন একটা শব্দপরিবারের মধ্যেই গিয়ে পড়ি।

অগ্নি

'অগ্নি' শব্দটি অগ্নির গতির নির্দেশক। অঙ্ +নি = অগ্নি। অগ্নি মানে যা উর্ধ্বদিকে যায়।

'তনূনপাৎ' শব্দটি বলছে যা সর্বদা উর্ধ্বদিকে যায়, তনুকে পাতিত করে না। অর্থাৎ নীচুদিকে যায় না। তনূ-ন+পৎ+ণিচ্+ক্বিপ = তনূনপাৎ।

অগ্নির রূপের কথা বলছে চিত্রভানু আর বিভাবসু। চিত্রভানু মানে ভানু বা যার কিরণ সুন্দর। বিভা যার বসু বা সম্পদ সে বিভাবসু।

অগ্নির দাহিকাশক্তির কথা বলছে, জ্বলন, দহন, পবন শব্দ। দহন মানে যা পরিপাক ঘটায়, অগ্নিমান্দ্য কথাটি লক্ষণীয়।

কৃপীটযোনি বলছে অগ্নির জন্মকথা। কৃপীট = কাষ্ঠ। কাষ্ঠ যোনি (জন্মস্থান) যার। কাষ্ঠ ঘর্ষণেই আগুন জ্বালানো হত একসময়ে।

অগ্নির বিশেষ একটি ধর্মের কথা বলছে 'বায়ুসখ' মানে বায়ু সখা যার। বায়ু যুক্ত হলেই অগ্নি প্রাণবন্ত হয়, বায়ুশূন্য স্থানে অগ্নিপ্রজ্বলন সম্ভব নয়।

হুতভুক্, হুতাশন, হব্যবাহন বীতিহোত্র শব্দ বৈদিক সমাজের যজ্ঞ ও হোমের সঙ্গে সম্পর্কিত। হুত অর্থাৎ যা আহুত তাই যার খাদ্য সে হুতভুক্। হুতাশন মানেও তাই। বীতিহোত্র মানে আহুতি বা ঘৃত যার খাদ্য। হব্যবাহন শব্দটির মধ্যে আছে একটি বিশ্বাসের কথা। আগুনে যা দেওয়া হয় আহুতি হিসেবে আগুন তা বহন করে নিয়ে যায় দেবোদ্দেশে। 'বহ্নি' শব্দটিতেও তারই ইঙ্গিত। বহ্+নি = বহ্নি–যা বহন করে।

আকাশ

আকাশ, গগন, ব্যোম ব্যাপ্তিসূচক অর্থ বহন করে। আ-কাশ+অ = আকাশ, কাশ্ ধাতুর অর্থ শোভা পাওয়া। আকাশ মানে যা সর্বত্র শোভমান। গগন কথাটি নিপাতনে সিদ্ধ, মূল আছে 'গম্' ধাতু, গগন মানে যার গতি সর্বত্র। ব্যোম বলছে আমি সবকিছুর প্রাবরক, সবকিছুর উপর ছাতার মতো আছি আমি। ব্যে = আচ্ছাদিত করা + মন্ = ব্যোম।

'খ' শব্দটি শূন্যতাবাচক। আকাশ শূন্যই বটে। অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা। 'মরুদ্‌বর্ত্ম' প্রতিশব্দটিও বিস্ময়কর– বায়ু চলার পথ। 'অন্তরীক্ষ' শব্দ বোঝাচ্ছে আকাশময় অবস্থান। অন্তঃ (স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে) যা দেখা যায় তাই অন্তরীক্ষ।

মেঘের সঙ্গে আকাশের সম্পর্কদোত্যক শব্দ নভঃ, ঘনপদবী, মেঘবেশ্ম। 'নহ্' ধাতু আছে 'নভস্' শব্দের মূলে, যার অর্থ বাঁধা। মেঘের সঙ্গে যা বাঁধা তাই হল নভঃ। ঘনপদবী মানে মেঘের পথ, মেঘবেশ্ম মানে মেঘের বাসা।

বিষ্ণুপদ শব্দটি পৌরাণিক। বিষ্ণুর ত্রিপাদভূমির অন্যতম আকাশ, তাই ঐ নাম।

চক্ষু

চক্ষু আর অক্ষি চোখের ধর্ম বোঝায়। যা বিষয়ে ব্যাপ্ত হয় তাই 'অক্ষি'। অক্ষ্ ধাতু = ব্যাপ্ত হওয়া। চক্ষু মানে যা দিয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়। 'চক্ষ্' ধাতুর অর্থ পর্যবেক্ষণ বা উপলব্ধি করা।

নয়ন লোচন নেত্র – এ-সব শব্দ চোখকে দেখছে একটি সাধন বা যন্ত্র হিসেবে যা দিয়ে নেওয়া যায় (অর্থাৎ দৃশ্য গ্রহণ করা যায়) তা নয়ন (নী + অন) বা নেত্র (নী + ত্র)। যা দিয়ে দর্শন করা যায় তাই হল লোচন (লোচি + অন) তিনটি পদেই করণবাচ্যে প্রত্যয়।

'দৈবদীপ' আর 'বিশ্বংকর' চোখের ধর্মকেই বুঝিয়েছে কাব্যিক দৃষ্টিতে। চোখ যেন দীপের মতো, যা সবকিছুকে সমুদ্‌ভাসিত করছে। এটি দেবতার দান, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রদীপ যেন।

আর সমস্ত কিছুকে উদ্ভাসিত করে বলেই তা 'বিশ্বংকর'। তা সমস্ত কিছুকে যেন সৃষ্টি করে বা সত্য করে তোলে। চোখ বুজলেই আর কিছু নেই।

সব নদী গিয়ে সাগরে মিলিত হয়। তাই সমুদ্র সিন্ধুনাথ, জলপতি। সমুদ্র শব্দটি থেকে নানা অর্থ দোহন করা হয়েছে– যা চন্দ্রোদয়ে ক্লিন্ন হয়, যা থেকে বহ্নি উদ্গত হয়, যা রত্ন ও জল দান করে ইত্যাদি। 'উন্দ্' ধাতুর বিভিন্ন অর্থ থেকে বা তার সম্প্রসারিত অর্থ থেকে এই সব অর্থ এসেছে।

সর্প

সাপের চলার ভঙ্গী বোঝাতে এসেছে অনেকগুলি নাম– সর্প (সৃপ্+অ), ভুজগ, ভুজঙ্গ (ভুজ-গম্+অ), উরস (উরস্-গম্+অ) পন্নগ, জিহ্মগ অর্থাৎ যে মাটিতে বুক দিয়ে হাঁটে, বক্রভাবে হাঁটে (ভুজ্-গম্+অ), পা দিয়ে হাঁটে না (পৎ- ন + গম্ + অ) ইত্যাদি। পা লুকনো এই বিশ্বাস থেকে 'গূঢ়পাদ' নাম হয়েছে সাপের।

জন্ম কিসের থেকে ? অণ্ড থেকে তাই 'অণ্ডজ' সাপের একটি প্রতিশব্দ। এখানে শব্দটি বিশেষ অর্থে যোগরূঢ়।

সাপের আবাস বোঝাতে আছে কয়েকটি শব্দ – নাগ, বিলেশয় ইত্যাদি। নগ বা পর্বতে যে থাকে (নগ+অ = নাগ) আর যে গর্তে শয়ন করে (বিল-শী +অ)। আকৃতি নিয়ে শব্দ ভেকমুখ– ব্যাঙের মতো মুখ যায়। দ্বি জিহ্বঃ বা দ্বিরসনঃ = দুটি জিভ্ যার। দীর্ঘজিহ্বঃ = দীর্ঘ জিভ যার। লতাজিহ্বঃ = লতার মতো জিভ যার। কঞ্চুকী (কঞ্চুক+ইন্) কঞ্চুক বা খোলশ। আছে তাই সে কঞ্চুকী। কঞ্চুক ত্যাগে সে উৎসুক তাই সে 'কঞ্চুকালু'। উদর বক্র তাই সে কাকোদর। (কাক = বক্র)। কর্ণ নাই, তাই সমস্ত দিকই তার কর্ণ তাই সে দিক্কর্ণ।

লোক শ্রুতি সাপ কান না থাকলেও চোখ দিয়ে শোনে, তাই সে চক্ষুঃশ্রবাঃ। কোনো কোনো সাপের আহার বায়ু তাই সে বায়ুভক্ষ।

বিষের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বিষধর, বিষানন, বিষাস্য, বিষায়ুধ, আশীবিষ (আশীতে = দন্তে বিষ যার)। সাপ চক্র ধরে তাই সে চক্রী বা কুণ্ডলী। ফণা আছে তাই সে ফণী (ফণ+ইন্), বা ফণাধর, স্বভাবে ক্রূর তাই সে 'ব্যাল'। বারবার দংশনে ইচ্ছুক, তাই সে দন্দশূক।

সূর্য

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিনের শুরু তাই সূর্য দিবাকর, দিনমণি, অহর্পতি, (অহঃ = দিন, অহঃ+পতি = অহর্পতি)। সূর্য ভা, ভাঃ (দীপ্তি) প্রভায় আধার তাই সূর্যের নাম ভাকোষ, ভাস্কর, (ভাঃ+কর), প্রভাকর।

সূর্য সমস্ত জগতের জীবনদাতা, প্রাণের প্রাণ। সূর্য না থাকলে প্রাণের সৃষ্টিই হত না, তাই সূর্যকে বলা হয়েছে সবিতা (সূ+তৃ = সবিতৃ > সবিতা)।

সূর্য সমস্ত জগতের ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করেন তাই তিনি জগচ্চক্ষুঃ বা কর্মসাক্ষী।

গ্রহগুলির সৃষ্টি সূর্য থেকেই তাই তিনি গ্রহরাজ।

সূর্যোদয়ে পদ্ম বিকশিত হয় তাই তিনি কমলাকান্ত বা পদ্মিনীপতি।

সূর্যের সাতটি অশ্ব তাই তিনি সপ্তাশ্ব। অশ্বের রঙ্ সবুজ, তাই তাঁর নাম হরিদশ্ব (হরিৎ অর্থাৎ সবুজ রঙের অশ্ব যার = হরিদশ্ব)। পুরাণমতে সূর্য মর্ত্তণ্ড বংশীয়, তাই তিনি মার্তণ্ড।

সূর্যের পত্নীদের নাম ছায়া, অশ্বিনী, প্রভা, সংজ্ঞা, সবর্ণা, তপতী ও ত্রসরেণু। তাই সূর্যের নাম ছায়াপতি, অশ্বিনীপতি, প্রভাপতি, সংজ্ঞাপতি ইত্যাদি।

'সূর্য' শব্দটির মূলে আছে 'সৃ' ধাতু, 'সৃ' মানে চলা, বিচরণ করা। 'সূর্য' শব্দটির অর্থ যা গতিশীল। আগে সূর্য গতিশীল বলেই বিশ্বাস করা হত। উপনিষদেও তাই দেখি –

সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্–নিরন্তর শ্রমরত সূর্যের দিকে তাকাও, যিনি চলতে চলতে কখনও ক্লান্ত হন না।

হস্ত

হস্তের ধর্মবোধক শব্দ 'কর' যা দিয়ে কিছু করা যায় (কৃ+অ, করণ বাচ্যে)। পাণি এসেছে পণ্ ধাতু থেকে। যা দিয়ে পণ্য উৎপাদন করা যায়। হাতের আকৃতি কাব্যিক ভাষায় বিধৃত– পঞ্চশাখ, ভুজাদল। আঙুলগুলো যেন বাহুলতার শাখা, বাদল।

মানুষের ভাগ্য হাতেই শুয়ে থাকে তাই হস্ত হচ্ছে 'শয়' (শী+অ)।

হাত যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ তা বোঝাতে হস্ত শব্দ। যা অন্যান্য অঙ্গকে উপহাস করে তাই হস্ত (হস্+ত)।

গৃহ

'যেখানে আমরা বাস করি' বোঝাতে বাস্তু, আবাস, সদন, নিকেতন। যথাক্রমে বস্, সদ্, ও কিৎ ধাতু এই তিনটি শব্দের মূল। সদ্ ও কিৎ লাক্ষণিক অর্থে বাস করা অর্থে ধরা হয়েছে। নিবেশন বা বেশ্ম এসেছে 'বিশ্' ধাতু (প্রবেশ করা) থেকে। অর্থাৎ যেখানে আমরা বসবাসের জন্যে প্রবিষ্ট হই।

ভবন এসেছে 'ভূ' ধাতু থেকে। আমরা যেখানে জন্মগ্রহণ করি ও বর্ধিত হই এই অর্থে ভবন (ভূ+অন)। নিকায় (নি-চি+ঘঞ্) ও নিকায্য = নি-চি+ণ্যৎ) শব্দের মূল অর্থ নির্মিতি বোঝায়, তাৎপর্য এটা ওটা দিয়ে আমরা ঘর বাঁধি, পাখি যেমন খড়কুটো দিয়ে নীড় বা বাসা করে। 'গৃহ' অর্থ যা আমাদের গ্রহণ করে।

শব্দের অর্থ-বদল

শব্দের অর্থ স্থির নয়, তা চঞ্চল। আর এই চাঞ্চল্য আছে বলেই শব্দকে চেতন বলতে ইচ্ছে হয়। শব্দের অর্থ বদলে যেতে পারে অন্য শব্দের প্রভাবে, কিন্তু বদলাবার সম্ভাবনা তার নিজের মধ্যেই আছে, কারণ ব্যঞ্জনা যেন শব্দের আত্মা। আর ঐ ব্যঞ্জনাতেই পরিবর্তন ঘটতে পারে। অনেক সময় অর্থের পরিধি যতটা ছিল তার চেয়ে বেড়ে যায়, একে আমরা বলি অর্থবিস্তার। যেমন 'কালি' শব্দটা আগে শুধু কালো কালিকে বোঝাত, এখন তা যে কোনো রঙের কালিকে বোঝায়।

কখনও অর্থের পরিধি কমে যেতে পারে, যেমন হিন্দু শব্দটা ভারতবাসী মাত্রকে না বুঝিয়ে এখন সম্প্রদায়বিশেষকে বোঝায়। একে আমরা বলি অর্থসংকোচ। কখনও কখনও শব্দের অর্থ নীচু থেকে একটু উচু দিকে হাত বাড়ায়, একে বলা হয় শব্দের উন্নতি, যেমন মন্দির এখন গৃহ না বুঝিয়ে বোঝায় দেবালয়। বিপরীতটা ঘটলে বলি অর্থের অবনতি যেমন 'ইতর' অপর বা অন্য না বুঝিয়ে যদি 'নীচ' বোঝায় তখন 'অর্থের অবনতি' ঘটেছে বলা যায়।

'অর্থসংশ্লেষ' পরিবর্তনের আর-একটি ধারা, 'ঘর্ম' গ্রীষ্মকালবাচক, কিন্তু তা যখন ঘাম বোঝাছে তখন 'অর্থ সংশ্লেষ' ঘটল। সংশ্লেষ মানে সংশ্লিষ্ট বা লগ্ন হয়ে থাকা। অর্থ বদলেছে বটে কিন্তু গ্রীষ্মেই তো ঘাম হয়, গ্রীষ্মের অর্থটি এখানে পরিবর্তিত অর্থকে যেন আলিঙ্গন করে আছে।

এই পর্বে আমরা এখন কয়েকটি শব্দ বিশ্লেষণ করব যেখানে এই ধরনের অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে।

অন্ন

যখন বলছি, 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই,' তখন 'অন্ন' শব্দের মূল অর্থটির আমরা গ্রহণ করছি। সে অর্থ হল খাদ্য ঃ অদ্+ত = অন্ন। যে কোনো খাদ্যই অন্ন। কিন্তু এই

অন্ন যখন 'ভাত' বোঝায় তখন তার অর্থ সংকুচিত হয়ে পড়ে :– "তাই তো চিন্‌তে পার, মোটা দুই অন্ন বাড়ো।"

আবৃত্তি

আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাৎ অপি গরীয়সী। আবৃত্তি সমস্তশাস্ত্রের বোধের চেয়েও বড়ো। এখানে 'আবৃত্তি' (আ-বৃৎ+তি) বারবার উচ্চারণ। কিন্তু যখন বলি 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুলি আবৃত্তি করো, তখন শ্রোতার কথা মনে রেখে ভাবরস বজায় রেখে কন্ঠে ঐ কবিতার উদ্দীপন আমরা বোঝাতে চাই, তখন ঐ মূল অর্থ থেকে বিশেষ একটি অর্থের দিকে যাই – 'আবৃত্তির' আদি অর্থটি থেকে এ-অর্থটি বিশ্লিষ্ট না হয়েও নতুন এক ইঙ্গিত বহন করে।

ইতর

'ইতর' শব্দটির মূল অর্থ অন্য বা অপর। 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ' অর্থ অন্য সবাই মিষ্টান্ন চায়। কিন্তু যখন বলি অতি 'ইতর' তুমি, তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। তখন ইতর শব্দটি বোঝায় 'নীচ' বা হীন। এক্ষেত্রে অর্থের যে অবনতি ঘটেছে তা বেশ বোঝা যায়।

উপবীত

উপবীত (উপ-বি-ই+ত) শব্দের মূল অর্থ 'নিকটে যাওয়া'। ব্রাহ্মণের এই উপবীত ধারণের তাৎপর্য হল ঈশ্বরাভিমুখিতা। শব্দটি এখন শুধু দেহে লগ্ন সূত্রটিকে বোঝায়। এখানেও শব্দের কিছুটা অপকর্ষ যে ঘটেছে তা সহজে বোঝা যায়।

করতাল

'করতাল' মানে দুই করে আঘাত করে প্রশংসাসূচক ধ্বনি তোলা। বাদ্যযন্ত্র এই হস্ত-সংকেতকেই অবলম্বন করে পরিকল্পিত। মূল অর্থ সংক্রমিত হয়েছে বাদ্যযন্ত্রটিতে।

কৃপণ

'কৃপণ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'কৃপালু', কিন্তু শব্দটি 'কঞ্জুস' বা ব্যয়কুন্ঠ হিসেবে চালু। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এখানে আদৌ নেই।

চিনি

'চীন' দেশের তৈরি বলে শর্করার এই নাম (চীন+ঈ = চীনী > চিনি)। চীনী শব্দটি চীন দেশে তৈরি যে-কোনো জিনিসকে না বুঝিয়ে বিশেষ একটি জিনিসকে বোঝাচ্ছে। তাই এটি যোগরূঢ় শব্দ, অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বহন করেও তা বিশেষ অর্থে প্রসিদ্ধ।

গৌরচন্দ্রিকা

গৌরচন্দ্র অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব কীর্তনের প্রবর্তক। তাই কীর্তনগানের আগে গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ গৌরচন্দ্রের কৃপাপ্রার্থনাদিবিষয়ক গান গাওয়া হয়। এর থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে কোনো বিষয়সূচনার আগে তার উপযোগী ভূমিকা করা। এখানে অর্থ আলংকারিক হয়ে উঠেছে।

গ্রাম

'গ্রাম' শব্দের মূল অর্থ 'সমূহ'। কয়েকটি গৃহের সমবায়েই প্রথমে যে আবাস পল্লী গড়ে ওঠে, তারই নাম হয়ে পড়ে 'গ্রাম'। মূল অর্থ পরিবর্তিত শব্দে সংলগ্ন হয়ে আছে।

ঘড়িয়াল

'ঘড়িয়াল' বিশেষ এক ধরনের কুমির, যার দাঁত খুবই তীক্ষ্ণ। শিকার ধরতেও সে খুব পটু। রূপকার্থে কোনো চতুর ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অবশ্য প্রয়োগের সময় চলিত 'ঘড়েল' রূপটিই বেশি দেখা যায়।

ঘর্ম

'ঘর্ম' কথাটির মূল অর্থ গ্রীষ্ম। এর থেকে গ্রীষ্মে নিঃসৃত দেহ-রস। অর্থ সংশ্লেষের উদাহরণ।

ঘাস

অদ্+অ = ঘাস। ঘাস মানে যে কোনো খাদ্য। কিন্তু তা 'তৃণ' অর্থে প্রযুক্ত। এখানে অর্থ সংকোচ ঘটেছে।

দারুণ

'দারু' মানে কাঠ। 'ন' প্রত্যয় যুক্ত হলে অর্থ হয়, কাষ্ঠময় বা কঠিন। এর থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে প্রচণ্ড বা প্রবল। এটিও অর্থসংশ্লেষ বা অর্থসংক্রমের উদাহরণ।

দিব্য

'দিব্' ধাতুর অর্থ পাশা খেলা। তার সঙ্গে 'য' প্রত্যয় যোগ হলে অর্থ দাঁড়ায় জুয়াড়ীর অঙ্গীকার। এর থেকে যে কোনো অঙ্গীকার। অর্থের প্রসার ঘটেছে এখানে।

দ্রব্য

'দ্রু' শব্দ বৃক্ষ বাচক। দ্রু+য = দ্রব্য, অর্থাৎ যা কাঠের তৈরি। কিন্তু শুধু কাঠের তৈরি জিনিস না বুঝিয়ে শব্দটি যে কোনো জিনিস বোঝায় বলে এখানে অর্থ সম্প্রসারণ ঘটেছে।

নীরাজনা

'নীরাজনা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আরাধনা (নির্- রাজ্+অন+আ) শরৎকালে রাজাদের বিশেষ অশ্বপূজার নাম নীরাজনা। এখন শব্দটি প্রদীপাদি আবর্তন করে দেবপূজা বোঝায়। অর্থের উৎকর্ষ ঘটেছে এখানে।

পাত্র

পাত্রের মূল অর্থ আধার বা ভাণ্ড। কিন্তু যখন বলি কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হবে তখন 'পাত্র' মানে পরিণেতা বা বর। এটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বোঝাচ্ছে না বলে একে রূঢ়ি শব্দ বলা সঙ্গত।

পাষণ্ড

'পাষণ্ড' মানে সম্প্রদায়। অশোকের অনুশাসনেও 'পাষণ্ড' শব্দটি এই অর্থেই প্রযুক্ত। কিন্তু এখন মানে দাঁড়িয়েছে ধর্মবোধহীন বা দুশ্চরিত্র। বলা বাহুল্য এখানে অর্থের অপকর্ষ ঘটেছে।

প্রবন্ধ

'প্রবন্ধ' শব্দটি সংস্কৃতে উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা অর্থ প্রযুক্ত। হিতোপদেশে শৃগাল বলছে ঃ ফলিতস্তাবৎ – কপটঃ প্রবন্ধঃ = আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এখন 'রচনা' (essay) অর্থে শব্দটি রূঢ়।

প্রসাদ

'প্রসাদ' মানে অনুগ্রহ। যখন বলছি 'প্রসাদ খা' তখন প্রসাদ বোঝাচ্ছে দেবোচ্ছিষ্ট দ্রব্য। এটিও রূঢ় শব্দ।

মন্দির

মন্দির শব্দটি সংস্কৃতে গৃহবাচক ছিল। মম মন্দিরমাগচ্ছ– আমার বাড়ি এসো। কিন্তু তা পরে দেবালয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এখানে অর্থের উন্নতি ঘটেছে।

মার্কিন

মার্কিন মানে আমেরিকাসম্বন্ধীয় বা আমেরিকায় প্রস্তুত। কিন্তু 'মার্কিন' বলতে যখন আমরা ঐদেশে তৈরি বস্ত্র বিশেষ বোঝাই তখন তা অর্থসংক্রমের উদাহরণ।

মিছরি

মিসরে যা তৈরি তা 'মিছরি'। কিন্তু সেখানে তৈরি সব কিছুকে না বুঝিয়ে বিশেষ একটি অর্থ বুঝিয়েছে। অর্থ সংক্রমণ ও অর্থ সংকোচ দুটি ধারাই এখানে প্রযোজ্য। এটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ।

মুমূর্ষু

মুমূর্ষু মানে যে মরতে চায় (মৃ+সন্+উ) কিন্তু মুমূর্ষু বলতে বাংলায় বোঝায় 'মরমর'। এটি অর্থসংক্রমের দৃষ্টান্ত।

লাবণ্য

লবণের ভাব অর্থে লাবণ্য (লবণ+অ) কিন্তু শব্দটা বোঝায় মাধুর্য বা সৌন্দর্য। লবণ ছাড়া যেমন কোনো ব্যঞ্জনই স্বাদু হয় না, তেমনি ঐ বিশেষ মাধুর্য ছাড়া কোনো শিল্পকর্মই আদৃত বা আকর্ষক হয় না। এখানে আলংকারিক

অর্থই প্রবল। প্রসঙ্গত একটি কবিতা উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যার বক্তব্য হচ্ছে ঐ লাবণ্যের অভাবে সব শিল্পই ব্যর্থ।

নুন ছাড়া গুণীদের বাণহীণ তূণ।
কথায় লেখায় গানে তাই খুঁজি নুন।

বচসা

'বচসা' শব্দটি 'বচস্' শব্দটির তৃতীয়া বিভক্তির একবচন। অর্থাৎ 'বচসা' মানে কথা দ্বারা। লাক্ষণিক অর্থে কথা দ্বারা কৃত কলহ।

বিরক্ত

'বিরক্ত' শব্দের আসল মানে বিশেষভাবে অনুরক্ত। কিন্তু বিরক্ত মানে ঠিক উল্টোটা। অর্থাৎ 'উত্ত্যক্ত' বা 'বিমুখ'। এটি রূঢ়ি শব্দ।

বেনারসী

বেনারসে যা তৈরি তা বেনারসী। কিন্তু ঐখানে প্রস্তুত বিশেষ শাড়ি অর্থে এই শব্দটি প্রযুক্ত। এখানে সংক্রমণ ও সংকোচন দুই-ই আছে।

ভয়ানক

ব্যুৎপত্তিগত ভাবে 'ভয়ানক' শব্দটির অর্থ 'ভীতিপ্রদ'। কিন্তু শব্দটি অত্যন্ত বা 'খুব' অর্থে প্রযোজ্য রূঢ়ি শব্দ।

মৃগ

'মৃগ' শব্দের মূল অর্থ যেকোনো পশু। 'হরিণ' অর্থে এটি অর্থসংকোচের উদাহরণ।

মার্গ

মৃগ চলার পথই আসলে মার্গ (মৃগ+অ), কিন্তু তা যেকোনো পথই বোঝায়, তাই এটি অর্থ সম্প্রসারণের উদাহরণ।

শুশ্রূষা

'শুশ্রূষা' মানে শোনবার ইচ্ছা। সেবকেরা যার সেবা করছেন তিনি কী বলেন তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকেন – সেবকা হি সেব্যে দত্তকর্ণা ভবন্তি। তার থেকে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে সেবা। অর্থসংক্রমের দৃষ্টান্ত।

সন্দেশ

'সন্দেশ'এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সংবাদ (সম্-দিশ্+অ)। কিন্তু যখন বলি ভীমনাগের 'সন্দেশ' তখন ওটা যে মিষ্টান্ন বিশেষ তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এখানে অনুপস্থিত বলে একে রূঢ়ি শব্দ বলাই সঙ্গত।

সম্ভ্রম

'সম্ভ্রম' এর মূল অর্থ বিচলিত ভাব বা বিচলিত অবস্থা। তার থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'শ্রদ্ধা'। মূল অর্থটি যে এখানে সংশ্লিষ্ট বা সংক্রামিত তা বোঝা যায়। যার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে তিনি যদি হঠাৎ বাড়িতে আসেন আমরা বিচলিত হয়ে পড়ি, কী করব, কীভাবে তাকে অভ্যর্থনা করব ভেবে পাই না।

সহজ

'সহজ' মানে সহজাত (সহ-জন্+ড) সরল বা সহজসাধ্য বা অকপট অর্থে শব্দটি রূঢ়ি।

সাহস

'সাহস' মানে যা সহসা কৃত। সহসা কিছু করতে ইতস্তত না করাই সাহস। অর্থ-সংক্রমের দৃষ্টান্ত।

সুতরাং

'সুতরাং' এর মূল অর্থ অত্যন্ত, নিরতিশয় (সু+তরাম্)। 'অতএব' অর্থে শব্দটি রূঢ়।

সুষ্ঠু

'সুষ্ঠু' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা সুন্দরভাবে আছে। (সু – স্থা+উ)। তার থেকেই অর্থ দাঁড়িয়েছে, সম্যক বা সঠিক বা যথোচিত। অর্থসংক্রম।

অন্ধকার

অন্ধ করে দেয় যা তা 'অন্ধকার'। অন্ধকার তো সত্যিই অন্ধ করে দেয়, ভালো করে দেখতে পাই না আমরা। শব্দটার মধ্যেই আছে তার কাজের ইঙ্গিত। আমরা একে অর্থ-সংশ্লেষ বলতে পারি।

অপরূপ

'অপ' উপসর্গটা আমরা সাধারণত খারাপ অর্থেই ব্যবহার করি, অপকর্ম, অপদেবতা, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি। 'অপরূপ' শব্দটার মানেও প্রথমে মনে হয় 'বিশ্রী রূপ যার'। অথর্ববেদে কুশ্রী বা কুৎসিত অর্থেই শব্দটার প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু পরে অর্থের উন্নতি হয়েছে ; মানে দাঁড়িয়েছে অতি সুন্দর অপূর্ব।

'একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লীজননী' (নজরুল গীতি)

অর্বাচীন

অর্বাচীন (অর্বাচ্+ঈন) শব্দটার অর্থ পরবর্তী। অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে 'নির্বোধ' অর্থে। একে আমরা অর্থের 'অপকর্ষ' বলতে পারি। কিন্তু 'পরবর্তী' অর্থটা যে একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে তা কি বলা যায় ? যারা পরবর্তী, অনেক পরে জন্মেছে অর্থাৎ অল্পবয়সী তাদের বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা তো প্রবীণদের চেয়ে কম হবেই।

অবতার

অবতার (অব-তৃ+অ) মানে অবতরণ, কিন্তু শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রচলিত। ঈশ্বরের মানুষ বা অন্য কিছু হয়ে জন্মগ্রহণকে অবতার বলে। 'অবতার' শব্দটা অবতরণকারী হিসেবেই বেশি চলে। এই পরিবর্তনকে সংশ্লেষ বা উৎকর্ষ হিসেবে ধরা চলে।

অসুখ

নয় সুখ = অসুখ। অর্থাৎ সুখের অভাব = দুঃখ। কিন্তু শব্দটি ব্যাধি বা রোগ বোঝাতে চলে। অবশ্য অসুখ হলে শারীরিক সুখ তো থাকে না, তাই মূলের অর্থ পরিবর্তিত অর্থের সঙ্গে লেগে আছে। এটি অর্থ সংশ্লেষের উদাহরণ।

আর্যপুত্র

'আর্যপুত্র' কথাটির মূল অর্থ কোনো পূজনীয় বা গুরুজনের পুত্র। কিন্তু তা সংস্কৃত নাটকে বিশেষ করে শ্বশুর-পুত্র অর্থাৎ স্বামীকেই বোঝায়। এটি রূঢ়ি শব্দের উদাহরণ।

আহ্নিক

আহ্নিক কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অহন্ বা দিনসম্বন্ধীয়। কিন্তু বাংলায় এই শব্দটি দিনে পালনীয় জপ। অর্থ সংশ্লেষ।

ইতস্ততঃ

ইতঃ মানে এইদিকে, ততঃ মানে ঐ দিকে। ইতস্ততঃ মানে এদিকে ওদিকে। মনটা যখন এদিক ওদিক করছে, তখন তাকে আমরা বলি 'দ্বিধা'। ইতস্তত কথাটির অর্থ তাই দ্বিধা বোঝায়। অর্থসংশ্লেষ। 'দ্বিধা' কথাটির মূল অর্থ দুইভাগে বিভক্ত হওয়া। মনটা দুভাগে বিভক্ত হয়ে করব কি করব না, এই ভাবটা প্রকাশ করে।

ইতি

'ইতি' মানে 'এই'। যা 'এই' বোঝাত তা 'শেষ' বোঝায়। 'আজ এইখানেই ইতি'। কিন্তু এই অর্থ পরিবর্তন ঘটল কী করে? মনে হয় চিঠিপত্রের বাগ্‌বিধি থেকে এই পরিবর্তন। চিঠিপত্রে বক্তব্যের শেষে থাকত 'ইতি'। অর্থাৎ এই আমার বক্তব্য। শেষে থামার জন্যে অর্থ দাঁড়িয়ে গেল 'শেষ'।

একাদশী

'একাদশী' পূর্ণিমা বা অমাবস্যার বিশেষ তিথিকে বোঝায় (একাদশের পূরণী)। এই তিথিতে উপবাসের চল আছে। তা থেকে একাদশী মানেই দাঁড়িয়ে গেল উপবাস। অর্থ–সংশ্লেষ।

কাপুরুষ

কু যে পুরুষ, সে কুপুরুষ বা কাপুরুষ। নিন্দা অর্থে 'কু' বিকল্পে 'কা' হয়। কিন্তু কুৎসিত পুরুষ 'ভীরু' অর্থে এল কেন ? পুরুষের যদি পৌরুষ না থাকে তাহলেই সে নিন্দনীয়। সাহস পৌরুষের অঙ্গ। সাহসের অভাবই ভীরুতা। তাই কাপুরুষের এই অর্থ। অর্থসংশ্লেষ।

কুশল

'কুশ' তুলতে যে পটু সে কুশল। কুশ তোলায় দক্ষ হতে হয়, অসাবধান হয়ে তুলতে গেলেই কুশবিদ্ধ হতে হবে। তাই কুশল মানে দাঁড়িলো 'দক্ষ'। অর্থসংশ্লেষ।

গবেষণা

সন্ধি বিচ্ছেদ করলে ঃ গো+এষণা = গবেষণা। গো = গোরু, এষণা = অন্বেষণ। অর্থাৎ হারানো গোরু খোঁজা। 'গোরু'র অন্বেষণ থেকে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো কোনো কিছুর তত্ত্ব অন্বেষণ অর্থাৎ যে বিষয় বিশেষ অধ্যয়ন বা চর্চা। সংশ্লেষ।

এ সিদ্ধান্তে বাদ সাধছে অথর্ববেদের একটি উক্তি 'গবাং গবেষণা' 'গোরুর গোরু খোঁজা' তো এ কথার অর্থ হবে না, অর্থ হবে গোরুর অন্বেষণ, তার মানে গবেষণা অর্থ শুধু অন্বেষণ, সন্ধি বিচ্ছেদটাই ভুল। 'গবেষ' নামে একটা ধাতুই পাওয়া যাচ্ছে, গোরুর সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই। অন্য কোনো প্রয়োগ এবিষয়ে আলোকপাত করতে পারে কিনা তা নিয়েই গবেষণা দরকার।

জন্তু

জন্তু (জন্+তু) মানে যে কোনো প্রাণী অর্থাৎ যে জন্ম গ্রহণ করেছে সেই 'জন্তু'। 'জাত' (born) আর জন্তু সমার্থক। তাই সংস্কৃতে 'জন্তু' শব্দটি 'মানুষ' অর্থেও দেখি, 'মাদৃশাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ' (আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষ)। বাংলায় কিন্তু 'জানোয়ার' অর্থেই শব্দটি চলে। এখানে অর্থ সংকোচ ঘটেছে।

তাৎপর্য

তৎপরের ভাব 'তাৎপর্য' অর্থাৎ মগ্নতা বা একাগ্রতা বা অভিনিবেশ। পরে অর্থ দাঁড়ালো 'গূঢ় অর্থ বা তত্ত্ব'। এখানে অর্থ পরিবর্তনের ধারা 'সংশ্লেষ'।

তৈল

তিল+অ = তৈল, অর্থাৎ যা তিল থেকে উৎপন্ন। কিন্তু এখন শব্দটা যেকোনো তেলই বোঝায়, সরষে থেকে হতে পারে, তিসি থেকে হতে পারে, অন্য কিছু থেকেও হতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে এখানে শব্দার্থের বিস্তার ঘটেছে।

দুহিতা

মূলে আছে 'দুহ্' ধাতু। 'দুহ্' মানে দোহন করা। আগে গৃহস্থের কন্যারাই দুধ দুইত। তাই তাদের এই নাম। অর্থ সংশ্লেষ।

বাতি

বর্তিকা মানে পলতে। বর্তিকা থেকে যখন 'বাতি' কথাটা এল তখন তা পলতে না বুঝিয়ে প্রদীপ বা অন্য আলোক-আধারকে বোঝালো। অর্থ সংশ্লেষ।

বিবাহ

'বিবাহ' শব্দের মূলে আছে 'বহ' ধাতু (বি–বহ্+অ)। এ শব্দটাতে একটা পুরনো প্রথার ইঙ্গিত আছে। জোর করে কন্যাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্রথা ছিল। এ অর্থ ধরলে অর্থ পরিবর্তনের ধারায় এটি 'সংশ্লেষ'।

কিন্তু সংস্কৃত অভিধানে তার অন্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় – 'বি' মানে বিশিষ্ট (অগ্নিসাক্ষিক) বহন বা স্বীকরণ = বিবাহ।

বেদনা

'বেদনা' শব্দের মূলে আছে 'বিদ্' ধাতু। বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা বা অনুভব করা। 'বেদনা' মানে, অনুভব (সুখ দুঃখের)। বাংলায় তা 'ব্যথা' (pain) অর্থে প্রচলিত হয়েছে। ব্যথায় অনুভব আছেই, তার মানে অর্থ সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। তাই অর্থ পরিবর্তনের ধারায় এটি অর্থসংশ্লেষ।

ব্যক্তি

ব্যক্তি (বি–অন্জ্+তি) মানে 'প্রকাশ'। বাংলায় তা মানুষ বা লোক বোঝায়। মানুষ প্রকাশ তো বটেই, তবু একটি বিশিষ্ট প্রকাশ, তাই এটি 'লোক' অর্থে যোগরূঢ়।

ভূত

'ভূত' মানে ক্ষিতি, অপ্ ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ বা প্রাণী। অপদেবতা অর্থে তা রূঢ়ি শব্দ।

মণ্ডপ

মণ্ড পান করে যে = মন্ডপ। কিন্তু মণ্ডপায়ী অর্থে শব্দটির ব্যবহার নেই। মণ্ডপ মানে মন্দির চত্বর বা গৃহ। লতাগৃহ অর্থে লতামণ্ডপ শব্দটির ব্যবহার আছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আদৌ বোঝায় না বলে এটিকে রূঢ়ি শব্দের উদাহরণ ধরা যায়।

মন্বন্তর

মনু + অন্তর = মন্বন্তর। অন্য মনু, নিত্যসমসা অথবা মনুর অন্তর (অবকাশ) যাতে, বহুব্রীহি সমাস। এক মনুর অধিকারের সময় ৭১ দিব্যযুগ (৭১ × ১২০০০ = ৮, ৫২, ০০০) বা মানব বর্ষ।

মনু পালনভার গ্রহণ করার মাঝের সময় প্রলয়কাল। তার থেকে বাংলায় অর্থ দাঁড়িয়েছে দুর্ভিক্ষ বা আকাল।'মন্বন্তরে মরিনি আমরা' (সত্যেন্দ্রনাথ)

মহাজন

'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি বা মহাপুরুষ।– মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ অর্থাৎ মহাপুরুষেরা যে পথে গিয়েছেন সেই পথই অনুসরণীয়। বাংলায় এ শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়ী বা সুদখোর। এখানে অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ ঘটেছে।

জনগণে যারা জোঁকসম শোষে
তারে মহাজন কয়,
সন্তানসম পালে যারা জমি তারা
জমিদার নয়।" (নজরুল)

মার্জনা

'মার্জনা' মানে পরিষ্কার করা। গৃহ মার্জনা = ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া বা পরিষ্কার করা। বাংলায় শব্দটির অর্থ ক্ষমা করা। 'ত্রুটি মার্জনা করিবেন'। এটিকে রূঢ়ি শব্দ হিসেবে ধরা চলে।

মৌন

মুনির ভাব 'মৌন' (মুনি+অ)। কিন্তু বাংলায় মৌন মানে নীরবতা। মুনিরা নীরব হয়ে ধ্যান করেন, তাই এই অর্থ পরিবর্তন। এখানে অর্থ-সংশ্লেষ ঘটেছে।

যবনিকা

সংস্কৃতে 'যবনিকা' মানে যবনের স্ত্রী বা পত্নী। সে ক্ষেত্রে নাটকে অঙ্কশেষে যে পর্দা ফেলা হয়, এই অর্থে শব্দটি রূঢ়ি, অর্থাৎ ব্যুৎপত্তির অর্থ আদৌ এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু 'যবনিকা' যবনপটী বা যবনদের ব্যবহৃত বা নির্মিত বিশেষ কাপড় অর্থে ধরলে, তা অর্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'সংশ্লেষ'।

রাগ

রাগ (√ রন্‌জ্+অ) শব্দের অর্থ সঙ্গীতের সুর বিশেষে অথবা অনুরাগ। ক্রোধ অর্থে তা রূঢ়িশব্দ।

শয্যাশায়ী

মূল অর্থ শয্যায় যে শুয়ে আছে। কিন্তু 'জ্বরে সে শয্যাশায়ী' বললে যে অর্থ বোঝায় সে অর্থে শব্দটি যোগরূঢ়।

শ্বাপদ

'শ্বা' মানে কুকুর। কুকুরের মতো পা যার সে শ্বাপদ। কিন্তু শব্দটি যে-কোনো হিংস্র চতুষ্পদ প্রাণীকে বোঝায়। বিস্তার।

সন্তান

সন্তান (সম্‌-√ তন্‌+অ) মানে বিস্তার। অপত্য বংশ বিস্তার করে বলে তার ঐ নাম। অর্থ সংশ্লেষ।

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"। (ভারতচন্দ্র)

সম্ভ্রান্ত

সম্ভ্রান্ত (সম্–ভ্রম্+ত) মানে বিচলিত 'রূঢ়' চঞ্চল। 'সম্ভ্রান্তাঃ বিহগাঃ = চঞ্চল বিহঙ্গেরা। বাংলায় 'অভিজাত' অর্থে তা সংশ্লেষ।

অর্থ পরিবর্তনের কারণ 'সম্ভ্রম' শব্দে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সভ্য

সভায় যে সাধু (ভদ্র) যে 'সভ্য'। এ থেকে সাধারণ ভাবে 'সভ্য' কথাটি 'ভদ্র' বা 'মার্জিত' অর্থে চলে আসছে। অর্থসংশ্লেষ।

সুবর্ণ

সু (সুন্দর) বর্ণনায় = সুবর্ণ। কিন্তু সুন্দর বর্ণের সব কিছুকে না বুঝিয়ে শব্দটি শুধু 'সোনা'কে বোঝায়। যোগরূঢ় শব্দ।

সৌধ

সুধা+অ = সৌধ। 'সৌধ' মানে সুধাধবলিত গৃহ অর্থাৎ চুনকাম করা অট্টালিকা। এখন শুধু অট্টালিকা অর্থে প্রচলিত।

শব্দতুলনা

অনেকসময় অন্যভাষায় তুলনীয় কোনো শব্দ যদি আমাদের কোনো শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তাহলে আমাদের বোধের পরিধি কিছুটা বিস্তৃত হয়, নিজেদের শব্দটিকে ভালো করে চিনে নেওয়া যায়। সুন্দর একটি শব্দ 'সংস্কৃতি'। এখন এর কী সংজ্ঞা দেব ? সংজ্ঞা দিতে গেলে শব্দটাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রকৃতি-প্রত্যয়ের দিকে তাকালে আমরা মোটামুটি একটা অর্থে পৌছে যাব। এরই সমগোত্র ইংরেজির 'culture' শব্দটা যদি নিই, এবং তা কে বিশ্লেষণ করি তাহলে মিলিয়ে দেখাবার একটু সুযোগ হয়। হয়তো কিছু মিল চোখে পড়বে, হয়তো কিছু অমিল। কিন্তু তুলনায় একটু বেশি করে জানার লাভটুকু হবেই।

এই ধরনের তুলনীয় কিছু শব্দ পাশাপাশি বেছে আমরা তাদের দিকে তাকিয়ে দেখব এই পর্বটিতে।

ধর্ম, religion, মজহব

ধর্ম শব্দের মূলে আছে 'ধৃ' ধাতু। 'ধৃ' মানে ধরে থাকা। যা ধরে থাকে তাই ধর্ম– ধৃ+মন্। ধরে থাকে মানে কী ? যা পড়ে যেতে দেয় না, অর্থাৎ যা মনুষ্যত্ব থেকে ভ্রষ্ট হতে দেয় না। যা ঠিক পথে রাখে।

ইংরেজি religion শব্দও অনেকেই একই কথা বলে। religion শব্দের মূলে আছে religare। religare মানে যা বেঁধে রাখে। তাৎপর্যের দিক থেকে 'ধর্ম' কথাটির সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে।

আরবী 'মজ্হব' শব্দটার মূল আছে (জহবুন্ ধাতু) তার মানে গমন করা। মজহব কথাটির ব্যুৎপত্তি অর্থ যে পথে গমন করা উচিত।

সংস্কৃতি, কৃষ্টি culture

যা সংস্কৃত বা মার্জিত করে তাই সংস্কৃতি। শিক্ষা সাহিত্যাদি আমাদের মনকে পরিমার্জিত করে তোলে তাই তাকে আমরা বলি সংস্কৃতি–আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। ইংরেজি 'কালচার' কথাটি কৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত। কালচার কথাটির মূল অর্থ 'কৃষি' (cultivation)। অকৃষ্ট বা অমার্জিত জমিতে তো ফসল ভালো হয় না, চাষী তাই ভূমিসংস্কার করে নেয় বীজ বপন করতে। তেমনি সুসংস্কৃত মন সু-ভাবনার উৎসভূমি। দেখা গেল culture শব্দটিও সংস্কৃতির মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে অভিন্ন।

'কৃষ্টি' কথাটি culture এরই অর্থ বহন করে।

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া –
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় ভূমি আর মন এক সুরে বাঁধা– সংস্কৃতি বা কৃষ্টি কথাটিও এই পঙ্‌ক্তিগুলিতে স্বল্পপরিসরে ব্যাখ্যাত।

ইতিহাস, history, তারীখ বা তওয়ারীখ

'ইতিহাস' কথাটির ব্যুৎপত্তি আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ইতি+হ+আস = ইতিহাস। 'এইরকমই ঘটেছিল'– এই হল ইতিহাস শব্দটির তাৎপর্য। ইতিবৃত্ত 33
কথাটি এর সমার্থক।

ইংরেজি history শব্দটির অর্থ মূলত গল্প। কিসের গল্প ? মানুষ বা সমাজ-জীবনের গল্প।

আরবী 'তওয়ারীখ' শব্দটার মানে তারিখপরম্পরা। অর্থাৎ পরপর ঘটনা বর্ণনা। তাহলে ইতিহাস বলতে আমরা বুঝব ঘটনা পরম্পরা বা ধারাবাহিক গল্প।

বই, book, কিতাব, পুস্তক

আরবী 'ওয়হী' শব্দ থেকে 'বই' এসেছে। ওয়হী > বহী > বই। 'ওয়হী' মানে দিব্য বাণী। তার থেকে মানে দাঁড়ালো দিব্যবাণী সম্বলিত কিছু– অর্থাৎ কোরান। তারপর অর্থ সম্প্রসারি꣢ হয়ে তা যেকোনো গ্রন্থকেই বোঝালো।

ইংরেজি Book শব্দ গ্রন্থের উপাদানের দিকে ইঙ্গিত করছে। Book এসেছে প্রাচীন জার্মানBuoch থেকে। যার মানে গাছের বাকল। একদিন মানুষ গাছের পাতা বা বাকলেই লিখেছে। আমাদের দেশের ভুর্জপত্র, নামেই পত্র আসলে তা ঐ গাছের বাকল।

'কিতাব' কথাটির মূলে যে ধাতু আছে তার মানে 'লেখা', 'কিতাব' এর অর্থ 'যা লেখা হয়েছে'।

'পুস্তক' মূলত দামী চামড়া। পার্চমেন্টে লেখা হত। শেষে চামড়ার 'বই' বোঝালো, তারপর, শুধু 'বই'।

কলম, লেখনী, Pen,

কলম কথাটি এসেছে 'কলামুস' থেকে। কলামুস মানে খাগ বা নল। আগে খাগের কলমেই লেখা হত। তার আগে লেখা হত আঁচড় কেটে। 'লেখনী' কথাটাই তার সাক্ষ্য। লেখনীর মূলে যে 'লিখ্' ধাতু তার মূল অর্থ আঁচড় কাটা। 'ষণ্ডঃ ভূমিং লিখতি' মানে ষাঁড় মাটিতে আঁচড় কাটছে।

Write কথাটির মূল যে প্রাচীন জার্মান ritzen শব্দটি আছে তার মানেও to scratch অর্থাৎ আঁচড় কাটা। প্যাপিরাস ও পার্চমেন্টেও কাগজে পালকের কলম দিয়ে লেখা হয়েছে। ইংরেজি Pen কথাটি তার সাক্ষ্য।

Pen এসেছে লাতিন Penna থেকে, Penna মানে পাখির পালক।

রাশিয়ায় Pero শব্দটি কলম বোঝাতে চলে, 'Pero' মানে পালক।

ডাক্তার, বৈদ্য, হাকিম

ইংরেজি doctor কথাটির মূল অর্থ জ্ঞানী। Doctorate উপাধিতে এই অর্থ বজায় আছে। এই উপাধিটা তাঁর জ্ঞানেরই সম্মান-প্রতীক। চিকিৎসকদের অবাক-চোখে দেখা হয়েছে আদ্যিকাল থেকে, অনেক ক্ষেত্রে দেবতার মতো মনে করা হয়েছে। সেই চিকিৎসককে যে প্রাজ্ঞ বলে মনে করা হয়েছে তা খুবই স্বাভাবিক। আসলে চিকিৎসক তাঁর অধীতবিদ্যাতেই শুধু নয়, তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকেই যথাযথ জ্ঞানী হয়ে ওঠেন।

আমাদের দেশের 'বৈদ্য' শব্দটিতে আছে একই অর্থ। বিদ্যায় যিনি বড়ো তিনি বৈদ্য– বিদ্যা+অ = বৈদ্য। আরবী 'হাকিম' শব্দটির অর্থ পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং চিকিৎসক।

আমাদের আয়ুর্বেদ চিকিৎসককে কবি হতেই হত। আয়ুর্বেদ মন্ত্র কবিতাতেই গ্রথিত, আয়ুর্বেদ-বৈদ্যকে বহু শাস্ত্রবিদ হতে হতে, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেও লিপিবদ্ধ করতে হত কাব্যের আধারে, তাই তিনি কবিরাজ।

সংস্কৃতে চিকিৎসকের একটি প্রতিশব্দ 'জীবদঃ' অর্থাৎ যিনি জীবন দান করেন। চিকিৎসক শব্দটিতে আছে বৈদ্যের রোগীকে সারিয়ে তোলবার ইচ্ছা।

মানব, আদমী, রাজুল

'মানব' মানে মনুর সন্ততি (মনু+অ = মানব)। মনুষ্যও মানুষ শব্দের ব্যুৎপত্তি একই অর্থ প্রকাশ করে। এটা হল পৌরাণিক বিশ্বাস। কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক 'মন্' ধাতুর সঙ্গে শব্দগুলিকে সম্পর্কিত করেন। 'মন্' ধাতু মানে চিন্তা করা। চিন্তা করতে পারার শক্তিই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে। প্রাচীন একটি প্রস্তরমূর্তিতে একটি আদিমানবের প্রথম চিন্তা-মুহূর্ত কল্পিত হয়েছে। মানব মনুষ্য ইত্যাদি সরাসরি মন্ ধাতু থেকে যদি না-ও আসে মূল 'মনু' শব্দটিতে আছে 'মন্' ধাতু, তিনিই আদি-মানব, প্রথম চিন্তক। ইংরেজি man বা জার্মান man এবং মূল ধাতু man যা সংস্কৃত মন্ ধাতুর সগোত্র।

ফার্সী 'আদমী' শব্দটি বলছে 'আদম' থেকেই মানুষ। এটিও শাস্ত্রীয় চিন্তা থেকে এসেছে। আরবী 'রাজুল' কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঋজু– অর্থাৎ Pithecanthopus Erectus.

ম্যাজিক, জাদু, ভোজবাজী

জাদুবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ ম্যাজিক এর মূলে আছে লাতিন 'ম্যাজিকা' যার মানে কলাকৌশল, ম্যাজিক তো মূলত কৌশলই। প্রাচীন ইরানের পুরোহিতকে বলা হত 'মগাস', এই পুরোহিত জাদুবিদ্যায় পারদর্শী হত। ম্যাজিক এই 'মগাস' থেকেও আসতে পারে।

'জাদু' ফার্সী শব্দ, মানে 'কুহক' বা মায়া। এই মায়াবিস্তার অর্থেই সংস্কৃত 'ইন্দ্রজাল' কথাটি এসেছে– ইন্দ্রনিয়ন্ত্রিত মায়া ; বা মহতী মায়া। আরবীর 'সিহ্‌র্‌' শব্দের মূলেও আছে এই মায়া।

রাজা ভোজ জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর নাম থেকেই আমরা ভোজবাজী শব্দটা পেয়েছি। বাজী শব্দটা ফার্সী। মানে খেলা, 'ভোজবাজী' মানে ভোজরাজার দেখানো জাদুর খেলা।

জাদুবিদ্যাকে বলা হয় 'ভানুমতীর খেল'। 'ভানুমতী' ছিলেন এই ভোজরাজারই কন্যা, বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী। ভানুমতীও জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। জাদুবিদ্যা-বাচক ভেলকি শব্দটির ব্যুৎপত্তি ভেল+কি। 'ভেল' মানে ভেজাল বা কৃত্রিম। বিশেষ্য গঠনে 'কি' প্রত্যয়। এই 'কি' এসেছে ফার্সী গী থেকে (তুলনীয় ঃ ইয়ারগী আমরা বলি ইয়ারকি)।

নগর, town, city, বলদ্‌

নগর শব্দটির ব্যুৎপত্তি নগ+র। আছে যার অর্থে এই প্রত্যয়। 'নগ' মানে পর্বত। আলংকারিক অর্থে উঁচু প্রাচীর। যা উঁচু প্রাচীরে বেষ্টিত তাই নগর। আগে নগর প্রাচীরবেষ্টিতই থাকত। ইংরেজি Town শব্দটি মূল মানে 'যা বেষ্টিত' পুরনো ইংরেজি 'Tun' মানে বেষ্টনী। City আর citadel আত্মীয় শব্দ। City ও আগে দুর্গের মতো সুরক্ষিত ছিল।

শহরবাচক আরবী শব্দ বলদ্‌। 'বলদ্‌'এর মূল অর্থ 'সুরক্ষিত আবাস'। আরবীতে পবিত্র নগরী বলতে মককা মদিনা বোঝাতো, পরে 'মদিনা' শব্দ যে কোনো শহরই বুঝিয়েছে। ফার্সী 'শহর' 'শাসিত এলাকার একটি বিভাগের 'নাম', বস্তী বা বড়ো কসবা (কসবা = সমৃদ্ধ গ্রাম)।

ঈশ্বর, God, Jehovah, খুদা, আল্লা

ঈশ্+বরচ্ = ঈশ্বর। ঈশ্ মানে ব্যাপ্ত করা। ঈশ্বর মানে যিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছে– ঈশা বাস্যমদিং সর্বম্ (উপনিষদ)। স্বয়ংভূ শব্দটি ফার্সী 'খুদা'র অর্থে প্রচলিত। নিজে (খুদ) থেকেই যিনি এসেছেন তিনিই খুদা। আরবী 'আল্লা' শব্দের ব্যুৎপত্তি পাওয়া দুষ্কর। আল্লার সিফাৎ বা গুণবাচক শব্দে তাঁর স্বরূপের ইঙ্গিত মেলে। যেমন– আর্ রহিম = পরমদয়ালু, আস্সালাম = শান্তিবিধায়ক, আল্খালিক = দৃষ্টিকর্তা, আল্-আলিম = সর্বজ্ঞ ইত্যাদি।

সত্তাপরিচায়ক নাম থেকেও নির্দেশ মেলে আল্আব্বল = অনাদি ইত্যাদি।

God শব্দ অজ্ঞাত মূল।

Old Testament-এ Jehovah শব্দের মূল উচ্চারণ yahweh। হিব্রুতে স্বরবর্ণ দেওয়া হত না। লেখা হত JHVH পরে Vowel যুক্ত হয়। adhonay শব্দের প্রভাবে, অর্থ দাঁড়ায় অনেকটা 'my lord' ঃ আমার প্রভু।

অভিধান dictionary লুগাৎ

অভিধান আসল শব্দাভিধান। শব্দকোষ বললে অর্থ স্পষ্ট হয়, কিন্তু শুধু কোষই শব্দকোষ বোঝায়। তেমনি শুধু 'অভিধান'ই শব্দাভিধান' বোঝায়। dictionary শব্দও সেদিক থেকে সমার্থক। diction মানে শব্দ আর ary প্রত্যয়ের মানে আধার। Lexicon মানেও একই ঃ Lexis আর on. On আধারই বোঝায়।

আরবীতে অভিধান বোঝাতে একটি ব্যাখ্যামূলক শব্দ-যুগ্ম চলে। কামুস্-উল্-লুগাৎ। 'লুগাৎ', মানে 'শব্দ' কামুস, মানে গভীরতা। অর্থাৎ শব্দের গভীরে প্রবেশের সুযোগ যা করে দেয়। অনেক সময় বলা হয় 'মিফ্তাহ্-উল্-লুগাৎ। মিম্তাহ্ মানে 'চাবি' — Key to the meaning of word। তার মানে শব্দের চাবি। শুধু 'লুগাৎ' কথাটাও অভিধান অর্থে চলে।

তাহলে দেখা গেল শব্দসংগ্রহই শুধু নয় শব্দার্থের দিকেও ইঙ্গিত করছে শব্দগুলো। 'অভিধান' কথাটার মধ্যে যে 'অভিধা' কথাটি লুকিয়ে আছে তার অর্থ শব্দার্থসংকেত।

ব্যাকরণ grammar ইল্ম্-উস্ সার্ফ ওয়ান্নাহব, কোয়ায়েদ।

ব্যাকরণ শব্দটার মূল অর্থ 'ব্যাখ্যান'। কিসের ব্যাখ্যান ? ব্যাক্রিয়ন্তে শব্দাঃ যেন ইতি ব্যাকরণম্। যা দ্বারা পদের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয় তাই ব্যাকরণ। gramma কথাটির মূলে আছে গ্রীক grammar শব্দ। gramma মানে বর্ণ (letter)। এই বর্ণ শব্দেরই প্রতীক। gramma কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ technique of words অথবা শব্দরীতি।

ব্যাকরণ আরবী ব্যাখ্যামূলক শব্দগুচ্ছ ইলম্ উস্ সার্ফ ওয়ান্নাহব্ অর্থাৎ শব্দের রূপসাধন আর বিন্যাস। আরবীতে এককথায় কোয়ায়েদ শব্দটি ব্যবহার হয় গ্রামার বোঝাতে। শব্দটি 'কায়েদ'র বহুবচন। 'কায়দা' পদ আমাদের খুবই পরিচিত। কায়দা মানে 'রীতি' বা প্রণালী। কোয়ায়েদ মানে রীতির সমষ্টি কিসের রীতি শব্দরূপ ও বাক্যগঠনের রীতি। প্রবাদের আছে আরবী কায়দা হেলে না। বিভিন্ন ভাষার শব্দ মিলিয়ে তাহলে দেখা গেল ব্যাকরণ শব্দব্যুৎপত্তি, শব্দরূপ ও বাক্যে শব্দের বিন্যাস সবই বোঝালো।

বাতায়ন window শাব্বক

বাতের (বাতাসের) অয়ন (গমন ফলাফল) যা দিয়ে হয় বাতায়ন। wind মানে বায়ু; ow এসেছে লাতিন auga থেকে auga মানে চোখ। তাহলে window = wind + eye. অর্থাৎ দেয়ালের চোখ যা দিয়ে বাতাস চলাচল করে। আমাদের 'গবাক্ষ' শব্দটার মধ্যে 'অক্ষি' কথাটা আছে। জানলা দেওয়ালের চোখই তো বটে। জানালা শব্দটা আমাদের নয়। পর্তুগিজ শব্দ (মূলের অর্থ outlet)। জানালা বোঝাতে আরবীতে শাব্বক' কথাটা বলে। শাব্বক মানে জাফরী। জানলার জাফরী দেওয়ার রেওয়াজ থেকে জাফরীবাচক শাব্বক শব্দটা জানলা বুঝিয়ে গেল।

তাহলে দেখা গেল জানলাকে দেয়ালের চোখ হিসেবে দেখা হয়েছে, দেখা হয়েছে হাওয়া চলাচলের পথ হিসেবে, জানলায় অলংকরণের দিক থেকেও চোখ ফেরানো হয় নি।

স্বর্গ heaven বিহিশ্ৎ

স্বর্গ শব্দের ব্যুৎপত্তি সু – ঋজ্ + অ। ঋজ্ মানে যাওয়া। অর্থ দাঁড়ায় সুগন্তব্য। যাওয়া জায়গা।

ইংরেজি heaven শব্দটা যা heave (lift) করা হয়েছে – অর্থাৎ উত্তোলিত। অর্থাৎ একটু নাগালের বাইরে, উঠিতে পারে যদি সুকৃতি থাকে।

ফার্সী বিহিশৎ বোঝায় সবচেয়ে ভালো জাগয়া। ফার্সী – 'ভূয়িষ্ঠ' (বহু + ইষ্ঠ) বলতে যা বোঝায় বিহিশৎ ঠিক তাই বোঝায়।

(আরবীতে আকাশ আর স্বর্গ বোঝাবার শব্দ একই ঃ ফলক – sphere)

দেখা যাচ্ছে স্বর্গ যে শ্রেষ্ঠ আবাস ও 'সবপেয়েছির দেশ' শব্দগুলো থেকে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

লোকনিরুক্তি

ভুল শুনে বা ভুল বুঝে যখন আমরা কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে নিজের মতো করে রূপ দিই, তাহলে তাকে লোকনিরুক্তি বলে। ইংরেজি Pendulum যখন 'পিণ্ডুলম্ব' হয়ে ওঠে, তেলিঙ্গা পাড়া যখন তেলেনী পাড়া হয়, গাদাবোট যখন গাধাবোট হয় তখন তা লোকনিরুক্তি।

এরকম হামেশাই ঘটতে পারে। 'পার্বতীসুতলম্বোদর' তো 'পাক দিয়ে সুতো লম্বা করো' হয়ে ওঠেই। Henry Yule ও A-C Burnell রচিত হবসন জবসন (Habson Jobson) অভিধানটির ইতিহাস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এটি ইঙ্গ-ভারতীয় কথ্য শব্দের একটি অভিধান।

মহরম পর্ব উপলক্ষে 'ইয়া হাসান ইয়া হোসেন' ধ্বনি– একটি ইয়োরোপীয় কানে 'হবসন-জনসন' রূপে ধ্বনিত হয়েছিল। তার পর থেকেই বোধ হয় ইঙ্গভারতীয় সমাজে শব্দটি প্রচলিত হয়ে ছিল।

এই পর্বে লোক-নিরুক্তি হিসেবে কিছু উদাহরণ ব্যাখাত হল।

উর্ণনাভ

বৈদিক ভাষায় মাকড়সার নম ছিল উর্ণবাভ অর্থাৎ উর্ণা বয়ন করে যে। শব্দটির মূলে ছিল বভ্ ধাতু (বয়ন করা অর্থে)। এটি কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে পড়ায় নাভি থেকে উর্ণা বেরোয় এই ধারণায় 'উর্ণবাভ' হয়ে পড়ে 'উর্ণনাভ'।

আরাম কেদারা

আর্ম চেয়ার হয়েছে আরাম কেদারা। আর্ম ধ্বনিসামঞ্জস্যে হয়েছে আরাম, arm-chair আরামদায়ক তো বটেই, তাই 'arm' হয়েছে 'আরাম'।

রংরুট

ইংরেজি recruit থেকে রংরুট।

বিষফোঁড়া

'বিস্ফোটক' হয়ে গেল বিষফোঁড়া। 'বিস্ফোটক'-এর উচ্চারণে বিস্-ফোটক এর বিস্ হয়ে উঠল 'বিষ'।

লেডিক্যানিং

লেডি ক্যানিং এর আগমন উপলক্ষ্যে তৈরি বিশেষ মিষ্টান্ন হয়ে গেল লেডিকেনি।

লজেঞ্চুস

লজেঞ্চুস এল ইংরেজি Lozenges থেকে। চুষে খেতে হয় বলে, মূল শব্দটার পূর্ব অংশের সঙ্গে 'চুষ' যুক্ত হয়ে গেল। মূল শব্দকে আর চেনাই যায় না।

পক্ষবাদ্য

পাখোয়াজ এসেছে পক্ষাতোদ্য থেকে। পক্ষাতোদ্য > পাখ্উজ্জ > পাখাওয়াজ > পক্ষেবাদ্য। যেহেতু এটি বাজনা তাই 'পক্ষাতোদ্য' হয়ে গেল 'পক্ষবাদ্য'।

ষণ্ডামার্কা

ষাণ্ডামার্কা থেকে। ষণ্ড ও অমর্ক দুই অত্যাচারী দৈত্যের নাম থেকে।

তানপুরা

তম্বুরা' হয়ে গেল তানপুরা।

রূপটান

উব্টান হল রূপটান। উবটান এসেছে উদ্বর্তন থেকে। উদ্বর্তন = অঙ্গরাগ।

খয়ের খাঁ

খয়ের খোয়াহ্ হয়ে গেল খয়ের খাঁ। খোয়াহ্ শব্দর মানে ইচ্ছুক। মানে না বুঝতে পেরে লোকে তাকে 'খাঁ' শব্দে রূপান্তরিত করে নিল।

কারচুপি

কারচোবী হয়ে গেল 'কারচুপি'।

এলারাম

ইংরেজি 'alarm' থেকে। 'এলারামের ঘড়িটা যে চুপ রয়েছে কই সে বাজে? – খাপছাড়া। রবীন্দ্রনাথ।

কৌতুক থেকেও যে লোকনিরুক্তি হতে পারে এটি তার উদাহরণ।

Bungalow

আমাদের 'বাংলা' ইংরেজিতে হয়ে উঠল bungalow.

Attor

আরবী ইত্‌র্ ওদেশে গিয়ে হল আত্তর আমরা তাকে নিলাম 'আতর' হিসেবে।

Godown

গুদাম ইংরেজিতে হয়ে উঠল godown.।

রিপিট

ইংরেজি রিভেট (Rivet) লোক মুখে হয়েছে রিপিট। 'রিভেট' বিশেষ এক ধরনের পেরেক।

জাঁদরেল

ইংরেজি general হয়েছে জাঁদরেল। জাঁদরেল জাঁদরেল সব লোক ছিল মিটিংএ।

টাকার কুমির

'টাকার কুমির বলতে বোঝায় তাকে যার অনেক টাকা । 'কুবের' হচ্ছেন ধনপতি । তাই 'টাকার কুবের' হয়ে উঠেছে । টামার কুমির (কুবের > কুবির > কুমির) ।

ড্যাঙ্কিবাবু

গতযুদ্ধের সময় কলকাতার বাবুরা গ্রামে গিয়ে শাকশব্জির দাম খুব কম দেখে বলতেন ড্যাম চীপ (dam cheap) । তাই হাটেবাজারে তাদের লোকে বলত ড্যাঙ্কিবাবু ।

ধ্বনিশব্দ

(ধ্বনি থেকে বস্তুবাচক শব্দ)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাংলাভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ । বহু অব্যক্ত ভাব এই ধ্বনিতে বোঝানো হয় । ধ্বনি আবার আদৌ ধ্বনি না বুঝিয়ে ভাব বোঝাতে পারে । যখন বলি বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে, তখন ফাঁকা অবস্থা বোঝাচ্ছে, কোনো আওয়াজকে না বুঝিয়ে ।

এই পর্বে আমরা শুধু সেইসব শব্দের উদাহরণ দিচ্ছি যারা দ্বিরুক্ত ধ্বনি থেকে উল্লেখ হয়ে ধ্বনি না বুঝিয়ে বস্তুবাচক শব্দ বোঝাচ্ছে ।

তুলনীয় ইংরেজি উদাহরণ Cuckoo, hotchpotch, bow-wow (dog) ইত্যাদি ।

একসময় 'bowwow' তত্ত্ব প্রাধান্য বিস্তার করেছিল । এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য ছিল মূলত সব শব্দই ধ্বন্যাত্মক ।

গড়্ গড়্ গড় গড় শব্দ থেকে গড়গড়া – তামাক খাবার বড় হুঁকা ।

তেমনি গুড়গুড় গুড় গুড় থেকে গুড়্ গুড়ি – ছোট্টহুঁকা, বা হুঁকার নল ।

তেমনি টিক্ টিক্ টিক্‌টিক্ শব্দ থেকে টিকটিকি – প্রাণীবিশেষ ।

রুমঝুম ঝুমঝুম শব্দ থেকে 'ঝুমঝুমি' – একটা খেলনা বিশেষ ।

ঘুর্ ঘুর ঘুরঘুর শব্দ থেকে ঘুরঘুরি – টিনের খেলনা ।

চট্‌পট্ চট্ পট্ শব্দ থেকে 'চটপটি' – আতসবাজী বিশেষ ।

বুজ্‌বুজ্‌ গুড়্‌গুড়্‌ থেকে বুজগুড়ি – ছোট বুদ্‌ বুদ্‌ তেমনি টুনটুন্‌ থেকে টুনটুনি, চক্‌মক্‌ থেকে চকমকি, ভট্‌ভট্‌ থেকে ভট্‌ভটি (মোটর সাইকেল)।

ধ্বনি অনেক সময় ধ্বনি না বুঝিয়ে বোঝায় ভাব, তা থেকেও শব্দ গড়ে ওঠে। ধুক্‌ধুক্‌ করে যা গলায় ঝোলে তা ধুকধুকি। চচ্চড়ি, বর্ব, ঘুলঘুলি শব্দও এইরকম।

গড়গড়া– বড়হুঁকো, গড়গড় থেকে। অনেক সময়ে 'আ' বা 'ই' কোনো প্রত্যয় যুক্ত না হয়েও ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বিরুক্ত হয়ে বস্তুবাচক হয়ে উঠতে পারে ঃ যেমন চমচম (মিষ্টান্নবিশেষ), টমটম্‌ (এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি)।

সংস্কৃত শব্দেও এই রকম ধ্বন্যাত্মক বস্তুবাচক বিশেষ দেখা যায় যেমন বুদ্‌বুদ্‌ (জলবিম্ব) কিঙ্কিনী (নূপুর) কোকিল, কাক, টিট্টিভ প্রভৃতি পাখির নামেও এই প্রভাব লক্ষণীয়।

হাঁসজারু শব্দ

হাঁস ছিল সজারু হয়ে গেল হাঁসজারু। দুটো শব্দ মিলে এমনি একেকটা মজার শব্দ তৈরী হয়। কোনো সময় দুটো শব্দখণ্ডকে চেনা যায়, কোনো সময় তাতেও অসুবিধে দেখা দেয়, বিশেষ করে যখন শব্দের অংশবিশেষ বাদ পড়ে। কথা না বাড়িয়ে বরং উদাহরণ দেওয়া যাক।

সংস্কৃতে শ্যেত বলে একটি শব্দ প্রচলিত ছিল মিশ্র রঙ বোঝাতে। আসলে ওটা তৈরি হয়েছিল দুটো শব্দ মিলে শ্যাম+শ্বেত = শ্যেত।

'মিনতি'– এই মিষ্টি শব্দটা যে আসলে বিনতি+আরবী মিন্নৎ শব্দের যোগফল তা ধরাই যায় না।

সংস্কৃতি বিজ্ঞপ্তি প্রাকৃতে হল বিণ্ণত্তি, তারপর তা থেকে এল বিনতি। হিন্দীতে 'বিনতি বজায় থাকল, বানানটা হল 'বিনতী', 'বিনতী হমারী সুনো মহারাজ'। কিন্তু বাংলায় বিনতি চলল না, 'মিন্নৎ' শব্দের ম্‌ এসে 'ব্‌' কে সরিয়ে দিল, তৈরি হল 'মিনতি'।

পিপাসা থেকে তিয়াস বা তিয়াসা। তৃষ্ণা তার 'ত' এর প্রভাবে তিয়াস বা তিয়াসা শব্দ সৃষ্টি করে তুলল। এসব শব্দকে ছোয়াচ লাগা শব্দও বলা চলে।

'নিশ্চুপ' শব্দটিও 'নিশ্চল' আর 'চুপ' মিলে চুপিচুপি তৈরি হয়েছে।

কুয়াসা ধোঁয়ার প্রভাবে আমাদের দিল 'ধোঁয়াসা' শব্দ। ইংরেজিতে smoke আর fog মিলে তৈরি হল smog.

নতুন সব্জির নাম হল পটেটোম্যাটো (patato+tomato)

ইয়ার+রিং = ইয়ারিং।

মুণ্ডমাল শব্দ

শব্দের মুণ্ডগুলো নিয়ে যদি নতুন শব্দ তৈরি হয় তাহলে তাকে আমরা বলছি মুণ্ডমাল শব্দ।

ইংরেজিতে এই ধরনের উদাহরণ RADAR — Radio Detection And Ranging.

বাংলায় লেখকদের নাম বোঝাতে আমরা এক ধরনের সংক্ষেপ করি। যেমন প্র না বি। বলার সময় একসঙ্গে করেই বলি প্রনাবির গল্পটা পড়ে ছিস ? প্রনাবি যে প্রমথনাথ বিশী তা তো সবাই জানে। কিন্তু 'প্রনাবি' শব্দ নয়, সংক্ষেপণ।

আমাদের মুণ্ডমাল শব্দের সঠিক উদাহরণ 'পিপুফিশু'। দুজন ঘুমুচ্ছে। ঘরে আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে তক্তপোষে। কিন্তু কেউ উঠছে না বিছানা ছেড়ে, দুজনে এত অলস। একজন বলল, 'পি-পু'। অর্থাৎ পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। এত অলস সে যে সম্পূর্ণ উচ্চারণে তার আলসেমি। আর-একজনও তেমনি, সে বলল 'ফিশু অর্থাৎ ফিরে শুই'।

এই পি-পু-ফি-শু মানে দাঁড়ালো অত্যন্ত অলস, তা অভিধানেও মর্যাদা পেল বাগ্বিধি হিসেবে। মুণ্ডমাল শব্দের আর একটি ভালো উদাহরণ 'সসেমিরা'।

সসেমিরা ব্যুৎপত্তি বোঝাই যাবে না, সম্পূর্ণ গল্পটা না বললে। গল্পটা দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় 'বহুশ্রুতোপাখ্যানম্' এর।

ভল্লুক রাজপুত্রকে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় দিয়েছিল, কিন্তু রাজপুত্র বিশ্বাসঘাতকতা করে ভল্লুককে মাটিতে ফেলে দিতে উদ্যত হলে ভল্লুক রাজপুত্রের গালে 'সসেমিরা' বলে এক চপেটাঘাত করল, এবং অভিশাপ দিল তুমি পিশাচ হও। রাজপুত্র 'সসেমিরা' বলতে বলতে পিশাচরূপ পেল। কবি শারদানন্দ আদ্য অক্ষর অনুসারে চারিটি শ্লোক পূর্ণ করলে রাজপুত্র প্রকতিস্থ হল। শ্লোক চারিটি এইঃ

সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা

অঙ্কে কুমারমাদায় হত্বা কিংনাম পৌরুষম্ ?

সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ব্রহ্মহা মুচ্যতে
পাপৈ র্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে।
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ
তে সর্বে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
রাজাসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণমিচ্ছসি
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥

শ্লোক চারিটির প্রথম অক্ষর যথাক্রমে স, সে, মি, রা। এই নিয়ে 'সসেমিরা' মানে সংকটাপন্ন। কী বলব ভাই, সসেমিরা হয়ে আছি।

কিছু শব্দ আছে যেগুলো কয়েকটি হরফ নিয়ে গড়ে উঠেছে, এরা কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নয়, বা আদ্য-অক্ষর নয়। হাবভাবে তাদের অর্থ নেই, কিন্তু মালায় গাঁথা হলেই বিশিষ্ট একটি অর্থ পাওয়া যায়, এরাও বাংলা বাগ্‌ধারার অন্তর্গত।

এইরকম শব্দ–

অ আ ক খ

হ য ব র ল

সা রে গা মা

এই বিষয়ের অ আ ক খ ই ও জানে না। অ আ ক খ মানে এখানে প্রাথমিক জ্ঞান হ-য-ব-র-ল মানে এলোমেলো, উল্টাপাল্টা: পরীক্ষায় হ-য-ব-র-ল কী যে এসেছিল।

সারে গামা জানে না নাম কালোয়াৎ! এখানে অ আখর মতো সঙ্গীতে প্রাথমিক জ্ঞান বোঝাচ্ছে।

একাক্ষর অর্থ-যুক্ত শব্দ দিয়েও এধনের শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন কে ও কে টা = কেওকেটা। অর্থাৎ গণ্যমান্য কেউ।

লঘুবুলি

সব ভাষাতেই কিছু এমন শব্দ এসে পড়ে যেগুলো শুনে অনেকের অ্যালার্জি হয়, অনেকে মেনে নেন হাসিমুখে। শব্দগুলো এমন ছোঁয়াছে, ছোটোদের মুখ থেকে বড়োদের মুখেও উঠে আসে। খচে যাওয়া, প্যাঁদানো, ধোলাই দেওয়া, গুলমারা, এসব তো ভাষাশিক্ষকদের মুখেও শোনা যায়। একটা ছবি দেখে বেরোচ্ছেন

পরিচিত একজন, জিজ্ঞেস করলেন 'কেমন দেখছেন' ? উত্তর ঃ 'ঝুল' । এখন প্রশ্ন এই ঃ এ ধরনের শব্দের কী কোনো ব্যাকরণ আছে, আছে ব্যুৎপত্তি যা অন্য সাধারণ শব্দের ক্ষেত্রে আছে ? কেন এধরনের শব্দ তৈরি হয় ? কারণ অনেক, সামান্য কিছু আলোচনা করা যাক ।

নুনলংকা বা টকঝাল এগুলো মুখোরোচক । শব্দের ক্ষেত্রেও একটু আড়ালে গিয়ে ফুচকা খাওয়ার মতো আটপৌরে শব্দ এড়িয়ে একটু অন্যভাবে বলতে ইচ্ছে হয় আমাদের । কখনও আমরা শব্দটাকে উল্টে দিই, যেমন 'ডিম' কে বলি 'মডি' । অনেক পরিবারে এইধরনের উল্টোকথার চল আছে । অনেক সময় ছোটোরা 'খাবি' ? না বলে বলে 'চিখাচিবি' । অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণের আগে একটা বাড়তি 'চি' বসিয়ে কথাটাকে অন্যের কাছে দুর্বোধ্য করে তুলে আনন্দ পাচ্ছে । রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় যে সঞ্জীবনী সভা হয়েছিল তারও সাংকেতিক ভাষা ছিল । সঞ্জীবনী সভার সাংকেতিক নাম ছিল 'হাঞ্চু পামু হাফ' ।

নিরর্থক শব্দসৃষ্টিরও একটা মোহ আছে । রবীন্দ্রনাথের 'বাচস্পতি' গল্পে, এর উদাহরণ আছে প্রচুর । একটু উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না ।

বাচস্পতি বললেন, "ছেলেটার বুঝকিন্ গোড়া থেকেই ছিল বুঝভুম্বুল গোছের । তার নাম দিয়েছিলাম বিচকুমকুর । মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ও নামটা কেন ? বাচস্পতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচকুমকুর । পাঠশালার পেডেঙ্গোকে দেখলেই তার আন্‌তারা যেত ফাঁচকলিয়ে । বুকের ভিতরে করতে থাকত কুড়ক্কুর কুড়ক্কুর । এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুসকে যাবে, এ কথাটা বলেছিল পাড়ার সবচেয়ে যে ছিল পেড়াম্বর হুড়ুমকি ।"

এই সব শব্দ উৎপাদনে বাচস্পতির নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল । আমরাও বাচস্পতি হয়ে উঠতে চাই মনে মনে । তাই আমরাও কিন্তু ঐ ধরনের শব্দ তৈরি করতে সচেষ্ট হই ।

আমরা যাকে লঘুবুলি বলেছি তা অভিধানে অপাঙ্‌ক্তেয়, কিন্তু মুখে মুখে তাদের ফাঁদ পাতা । ছাত্র বা তরুণদের মুখেই এই সব শব্দের বুকনি শোনা যায় ।

যেমন, একজন কলেজের ছাত্র বন্ধুদের বলছে ঃ 'হসপি যাবি ? ঢপ দিসনা । টিয়াবি চল্' ।

এখানে দেখা যাচ্ছে হসপিটাল 'হসপি' হয়ে উঠেছে । ঢপ দেওয়া মানে চাল মারা বা মিথ্যে বলা । ঢপ্ হচ্ছে ফাঁকা জিনিসের আওয়াজ । আলংকারি অর্থে ফাঁকা বুলি মিথ্যে বুলি হয়ে উঠেছে । টী (tea) নামধাতু হয়েছে এখন টীয়াবি মানে 'চা খাবি' ? তার মানে শব্দগুলো তো ভুঁইফোঁড় না ।

কোনো কিছু গোপন করবার ইচ্ছে থেকে এধরনের শব্দ তৈরি হতে পারে। আমরা দুজনে বলছি, কিন্তু অন্যে যেন না বোঝে। শেষ পর্যন্ত হয় কি ? দুজনের মধ্যে নির্দিষ্ট কজনের মধ্যে তা আর সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ সমাজজীবন তো আর খোপে খোপে ভাগ করা নয়, মেলামেশায় মধ্যে দিয়ে যা ছিল একান্ত তা হয়ে উঠল সাধারণ। 'চামচে' মানে এখন কেনা জানে ? এই শব্দ রচনার উৎস যাই হোকনা কেন এখানে পাওয়া যাবে একটু রূপক অর্থের ছোঁয়া। কোথাও বা কিছু কৌতুক কটাক্ষ ঃ এইখানেই ছাতি ছিল ভাই একেবার হাপিস হয়ে গেল। কথাটা 'হাফিজ' থেকে এসেছে। হাফিজ মানে রক্ষক। তা থেকে রক্ষা। এখানে বোঝালো অ-রক্ষা, অর্থাৎ চুরি।

নাম নিয়ে

(মানুষের নাম)

নামে কী এসে যায় ? — একথা মানতে আমাদের কষ্ট হয়। মানুষের নামই হোক আর দেশের নামই হোক, জায়গার নামই হোক, আর রাস্তার নামই হোক সব কিছুর সঙ্গেই জড়িত আছে কোনো না কোনো ইতিহাস, কোনো না কোনো স্মৃতি, সোহাগে ভালোবাসায়।

তাই বলতে ইচ্ছে হয় Nomen ist Omen. নামই লক্ষণ। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন নিয়ে প্রবাদে কটাক্ষ করা হয়েছে, কিন্তু ঐ নামকরণের পিছনে যে একটি স্নেহবিহ্বল হৃদয় আছে তা কী করে ভুলি ?

'আন্নাকালী' এখন স্বামীপুত্র নিয়ে হয়তো সংসার করছে কিন্তু একদিন তার জন্মলাভ যে অভিনন্দিত হয় নি কন্যা বলে, সে ইতিহাস তো ঐ নামেই ধরা আছে — 'আর না কালী', কালীর কাছে প্রার্থনা আর যেন সন্তান না আসে।

কারো নাম রাখছেন বাবা-মা, কারো জ্যেঠা কারো কাকা। সে-সব নামের মধ্যে কখনও থাকছে পূর্বজের নামের সঙ্গে মিল, কখনও বা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কোনো ছবি মনে করে আশাভরা কোনো নাম — পথিকৃৎ, কিংবা সর্বজয় কিংবা চিরঞ্জীব। কেউ তাঁর আরাধ্য দেবতার নাম মিশিয়ে দিচ্ছেন নামের সঙ্গে— শিবসুন্দর, দুর্গাশংকর। কেউ মায়ের স্নেহ নিঙড়ে হচ্ছে 'আনন্দ' কেউ 'রূপক', কেউ বা 'হীরক'।

পদবীর কথাই কি আমরা ভেবে দেখি — কোথা থেকে এলাম আমি। কেউ সরকার, কেউ দস্তিদার, কেউ মজুমদার, কেউ সমাদ্দার, কেউ চাকলাদার— সব ফার্সী পদবী। জমিদারী সেরাস্তার বিভিন্ন কাজের ভার নিয়েছেন একদিন— এইসব উপনাম যাঁদের তাঁদের পূর্ব পুরুষ।

কেউ গোত্র নামেই চিহ্নিত – ভরদ্বাজ, কি কাশ্যপ কি গৌতম। এইসব নামগুলো সবই একদিন তাদের কুলচিহ্ন ছিল। আদিবাসীদের টোটেমের মতো। এগুলোর মুনির নাম হলেও মূলত পশুপাখির নাম ভরত+বাজ = ভরদ্বাজ, কাশ্যপ কচ্ছপের সমার্থক। গৌতম = প্রকৃষ্ট গৌ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় জানাচ্ছেন তাঁদের বৃত্তি। উপধ্যায়েরা আচারে বিদ্যায় বিনয় তপ, দান ইত্যাদি নয়টি গুণে বিভূষিত, উপধ্যায়ের আগের অংশটুকু অঞ্চলবাচক ঃ গঙ্গ (বর্ধমান জেলার বাঁকানদের কাছে) চট্ট, (বর্ধমান জেলার চাট্‌তি)। বন্দ্য (বীরভূম জেলার অন্তর্গত বন্দিঘট)। মুখ (বাঁকুড়া জেলার অম্বিকা পরগনায় মুকুটী) উপাধ্যায়দের বৃত্তি ছিল মূলত অধ্যাপনা। উপাধ্যায় থেকে 'ওঝা'। চট্ট, বন্দ, মুখ এর সঙ্গে ওঝা যুক্ত হয়ে চলতি উচ্চারণে – চাটুর্জে, ব্যানার্জি, মুখুজ্জে চলেছে। আর 'গঙ্গ'-র সঙ্গে কুলিক > উলিঅ > উলি যুক্ত হয়ে গাঙ্গুলী।

মুসলিম নামগুলো কী সুন্দর। আখতার উজ্জমান = আখতার- আল্- জমান = সময়ের তারকা। কমরুদ্দীন কমর+আল+দীন = ধর্মের চাঁদ। কবি হাফিজের নাম শাম্‌স্-উদ্দীন অর্থাৎ ধর্মের সূর্য। 'হাফিজ' মানে সমগ্র কোরান যার স্মৃতিতে বিধৃত।

ঐতিহাসিক নামগুলিও কী সুন্দর জাহানআরা = পৃথিবীকে যিনি ভূষিত করেন। আওরঙ্গজেব = সিংহাসনে যিনি অলংকৃত করেন। জাহাঙ্গীর = ভূমণ্ডলকে যিনি ধারণ করেন। শাহজহান = ভূমণ্ডলের যিনি অধীশ্বর।

ইংরেজদের নামেও আছে বৈশিষ্ট্য। Johnson মানে son of John - জনের ছেলে। Williams = ইউলিয়ামের ছেলে। Jones = জনের ছেলে। Davis = ডেভিডের ছেলে। Wilson = Will or William এর ছেলে।

পেশা থেকেও উপনাম আসে Miller, Taylor, Smith.

অঞ্চল থেকেও নাম হয় ঃ Lincoln, Bonstow, Green, Becket (নদীর কাছে), Mill ইত্যাদি।

চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য অনুসারেও পদবী হত। Strong, Small, Longfellow.

বাবার ডাক নাম থেকে নাম ঃ Dixon = Son of Dick (ডাক নাম)। Robson = son of Rob i.e. Robert. Thompson = son of Tom (ডাক নাম) আসল নাম টমাস।

বাইবেলের নাম থেকেও নাম হয়-- Jones, Mathew, Abraham, Joseph, Sara, Esther, Martha. ছেলে বোঝাবার জন্যে আছে কয়েকটি উপসর্গ (affix) ঃ O, Mac, Mc, Fitz.

B-O' Connor = এর ছেলে। Mac Dougal = Dougal এর ছেলে, Mc Innis = Innis এর ছেলে। Fitzgerald = Gerald এর ছেলে।

(দেশ ও জায়গার নাম)

এবার মানুষ থেকে দেশের নামে আসা যাক।

ভারতবর্ষের নাম 'সিন্ধু' নদীর নামের স্মৃতিবাহী। ঈজিপ্টের নামে নীলদের স্মৃতি জড়িত। আইজুক্তস্ বলা হত ঐ নদীকে, তার থেকেই দেশটির নাম। মিশরটা আরবী মিস্র্ থেকে। মেসোপটেমিয়ারও দুটি নদীর স্মৃতি বয়ে বেড়ায়। 'পটেমাস' মানে নদী ; 'মেসো' মানে মধ্যবর্তী। ব্যাবিলনের সঙ্গে যুক্ত নগরদেবীর নাম। জাপান মানে সূর্যোদয়ের দেশ (উচ্চারণ ড়ুপান)। চীনের নাম চুঙ্গোয়া, মানে মধ্যবর্তী। তিব্বত তোদ-বোদ থেকে, 'তোদ' মানে উচ্চ = বোদ ভোট। উচ্চ ভোটেদের দেশ। ভুটান মানে ভোটদের – ভোটানাম্। ভোটানাং থেকে যেমন ভুটান, আইয়ার্নাং (অর্যোণাম্) থেকে তেমনি ইরান। সারা পৃথিবীর দেশগুলোর নামে আছে স্মৃতিজড়িত ইতিহাস।

আমরা সরাসরি 'বঙ্গে' আসি। 'বঙ্গ' কথাটার মূল খুব সম্ভবতঃ তিব্বতী বনস্ বা বন্ শব্দ। ঐ শব্দের অর্থ জলময় বা স্যাঁৎসেতে। বঙ্গ পুরাকালে নদীবহুল ও জলপ্রায় দেশই ছিল। রঘুবংশের বর্ণনায় (৪।৩৬) রঘু যে বঙ্গরাজদের উৎখাত করেছিলেন তাঁর প্রধান বল ছিল নৌবল।

বৃহৎ বঙ্গে তাম্রলিপ্ত (তমলুক) সপ্তগ্রাম (সাতগাঁ) ইত্যাদি রাজধানী ছিল। পরে 'কলিকাতা' হল রাজধানী।

কলকাতার ৩০০ বছর পূর্ণ হল, আমাদের মনে উৎসবপূর্তির স্মৃতি এখনও অম্লান।

কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি নিয়ে তো কত মত আর মতান্তর। এবারে আমরা কলকাতা এবং কলকাতা সম্পর্কিত কয়েকটি নামের জন্মকথা আলোচনা করব।

কলিকাতা ও সম্পর্কিত কিছু নাম।

কলিকাতা

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক যে ঘেসেড়া। এক সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জায়গাটার নাম কী গো ? ঘেসেড়া ভাবল সাহেব বুঝি জিজ্ঞেস করলেন ঘাস কবে কাটা ? তাই সে জবাবে বলল, 'কাল কাটা', সাহেব ধরে নিল জায়গাটার নাম কালকাটা। ওমনি ইংরেজি উচ্চারণে তিনি তাকে করে নিলেন 'ক্যাল্‌কাটা'।

এ গল্প বিশেষজ্ঞরা মানেন না। বলেন এটা স্রেফ গালগল্প। কলিকাতা ক্যালকাটা হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু বিপরীতটা সম্ভব নয়।

আর এক গল্প । পর্তুগিজরা ব্যাবসা করছে কালিকট থেকে । সুতানটিতেও কাপড়ের ব্যাবসা আছে । কিন্তু 'মেড ইন কালিকট' বললে যে কদর হয় জিনিসের 'মেড ইন সুতানুটি' বললে কি আর তা হয় ? তারা একটু অদলবদল করে কালিকটকেই Kalikata করে নিল ।

আবার গল্প । ইউরোপীয় বণিকেরা তখন জঙ্গলে-ঢাকা চৌরঙ্গীকে বলত 'গলগাথা' । ডাচ ভাষায় গলগাথা মানে মড়ার খুলি । ঐ গলগাথাই ক্রমে কলকাতা হয়েছে ।

দুটো গল্পই নাকচ করে দেন বিশেষজ্ঞরা ।

অনেকে বলেন এখন যেখানে সার্কুলার রোড বর্গী হানাদারদের ভয়ে ওখানে খাল কাটা ছিল । ঐ 'খাল কাটা' থেকেই 'ক্যালকাটা' নাম ।

আরও কত গালগল্প । শেষে অনেকে বললেন কালীঘাট-টাই প্রাচীন, ঐ নাম থেকেই কলিকাতা হয়েছে । কালীঘাট+আ = কালীঘাটা ।

কালিঘাটা > কালিকাতা > কলিকাতা ।

অনেকেরই মনে হল এটা সম্ভব বটে । কিন্তু কেউ কেউ বললেন কালীঘাট কথাটা থেকে কলকাতার নাম হয় নি, হয়েছে 'কালীক্ষেত্র' থেকে ।

আচার্য সুনীতি কুমার বললেন আসলে কলি চূনের কাতা এখানে ছিল এবং সেটাই প্রধান ব্যাবসা ছিল, তাই জায়গাটার নাম ছিল 'কলিকাতা' । বিতর্ক এখনও চলেছে ।

সুতানুটি

কলিকাতা যেমন 'কলি'র (কলিচূনের) কাতা থেকে, অনেকে বলেন সুতানুটিও সুতার নুটি থেকে । এখানে ছিল সুতোর ব্যাবসা । সাহেবেরা তাই রঙ্গ করে বলতেন Cattonopolis. অর্থাৎ তূলোর নগর ।

গোবিন্দপুর

১৫৩৭ এ মুকুন্দরাম শেঠ কালীক্ষেত্রে কালীঘাটের কাছ এসে বাস করতে থাকেন । কিছুদিন পরে সেখান থেকে লালদীঘির কাছে উঁচু জায়গায় উঠে আসেন । তাঁর গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নাম অনুসারে জায়গাটার নাম হয় গোবিন্দপুর ।

মুকুন্দরামের ছেলে লালমোহন । বাবার সঙ্গেই তিনি আসেন গোবিন্দপুরে । দীঘিটা তিনিই কাটিয়েছিলেন, তাঁর নাম অনুসারে দীঘির ঐ নাম ।

লালদীঘি নামের পিছনে অন্য গল্পও অবশ্য আছে । সুতানটী-গোবিন্দপুর কলকাতা নামের ইতিহাসের পর এবারে আমরা কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলের নাম নিয়ে আলোচনা করি ।

চিৎপুর

চিত্রেশ্বরী মন্দিরের নাম অনুসারে ঐ অঞ্চলের নাম হয় চিৎপুর। অনেকে মনে করেন চিত্তেশ্বর বা চিতে ডাকাতের নাম অনুসারেই মন্দিরের ঐ নাম।

চৌরঙ্গী

কলকাতা পত্তনের সময় অঞ্চলটি ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী নামে নাথসম্প্রদায়ের এক সাধু এই অঞ্চলে থাকতেন। সম্ভবত তাঁর নাম থেকেই অঞ্চলটির নাম চৌরঙ্গী হয়েছে।

ইডেন গার্ডেনস্

কলকাতাকে ভালোবেসেছিলেন লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন এমিলি আর ফ্যানি ইডেন। তারাই ইডেন গার্ডেন তৈরি করেন। তাঁদের নাম অনুসারেই অঞ্চলটির ঐ নাম।

স্ট্র্যাণ্ডরোড

ইডেনের গা ঘেঁসে স্ট্র্যাণ্ডরোড। 'স্ট্র্যাণ্ড' মানে নদীতীর। এর নাম আগে ছিল 'সুমাত্রা স্ট্র্যাণ্ড'। সুমাত্রা নামে একটা জাহাজ ডুবে গিয়েছিল ঐখানে। ১৮২৩ তৈরি হয়েছিল এই রাস্তা।

টালিগঞ্জ

ক্যাপটেন টালী সাহেবের নাম অনুসারে টালিগঞ্জের নাম হয়। আদি গঙ্গার উপর নির্মিত ব্রিজটিও তাঁর নামে চিহ্নিত।

কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের নাম গড়ে উঠেছে সেখানকার কোনো বৃত্তি বা ব্যাবসাকে কেন্দ্র করে ঃ যেমন কুমোরটুলি, পোটোপাড়া, কাঁসারিপাড়া, নস্করপাড়া, মুচিপাড়া, কসাইপাড়া। কোথাওবা নামগুলো বহন করছে কোনো গাছপালার স্মৃতি ঃ বটতলা, নিমতলা, ঝাউতলা, আমড়াতলা। কখনও বা কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির নামে তা চিহ্নিত, যেমন হরিশমুখার্জি রোড, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট ইত্যাদি। কখনও বা কোনো মন্দির বা মসজিদের নামে তার নামকরণ ঃ কালীবাড়ি লেন, মসজিদ বাড়ি লেন। পুরনো নামগুলোর বেশির ভাগই ছিল ইংরেজ শাসকদের নামে, সেগুলোর নতুন নামকরণ হচ্ছে, বিভিন্ন মনীষী বা বিপ্লবীদের নামে। ডালহৌসী

স্কোয়ার যেমন এখন বিনয় বাদল দীনেশ বাগ । বহু নামকরণের রহস্য এখনও অজ্ঞাত । আশা করা যায় নূতনতর গবেষণায়– অনেক অজানা বিষয়ের উপর আলোকপাত ঘটবে ।

ফ্যান্সিলেন

ফ্যান্সিলেন আসলে ফাঁসির গলি । ফাঁসি কথাটা ইংরেজিতে লিখতে গেলে হবে 'fancy' ইংরেজিতে i এর বদলে y এসে জুড়ে বসল – শব্দটি বদলে গিয়ে হল Fancy. যেন কত সুন্দর গলিটি । ব্যাপারটা আদৌ fancy নয় । জোব চার্ণকের সময় কলকাতায় ফাঁসি দেওয়া হত সামান্য অপরাধে । ফ্যান্সিলেন ওয়েলসলি প্লেস থেকে কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত । জব চার্ণক ফ্যান্সিলেনের মোড়ে ফাঁসির মঞ্চ স্থাপন করেছিলেন ।

সদর স্ট্রীট

কলকাতা জাদুঘরের উত্তর দিকে, যে পথটি চৌরঙ্গী রোড থেকে সোজা ফ্রীস্কুল স্ট্রীটে মিশেছে, সেই পথটির নাম সদর স্ট্রীট । আগে এই রাস্তার নাম ছিল স্পিক স্ট্রীট । স্পিক সাহবরের কুঠী ছিল এই রাস্তায় । তিনি তখনকার সরকারকে এটি ভাড়া দেন । সরকার এখানে সদর-কোর্ট নামে একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করেন । এই সদর কোর্ট ই কলকাতার প্রথম দেওয়ানী আদালত । এই সদর কোর্টের নাম থেকেই রাস্তাটির নাম হয় সদর স্ট্রীট । ১০ নং সদর স্ট্রীটে রবীন্দ্রনাথ একসময় ছিলেন । নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি তিনি এখানেই রচনা করেন ।

কয়লাঘাট স্ট্রীট

বি-বি-ডি বাগের পশ্চিম দিকে স্ট্র্যাণ্ড রোড পর্যন্ত যে পথটি গিয়েছে সেই পথটির নাম কয়লাঘাট স্ট্রীট । এই পথের ধারেই কলকাতার পুরনো কেল্লার পশ্চিম প্রাচীর ছিল । এই প্রাচীরের কাছেই যে ঘাটটি ছিল তার নাম ছিল 'কেল্লাঘাট' । উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এই ঘাট থেকে জাহাজ মারফৎ পাথুরিয়া কয়লা চালান দেওয়া হত । এর থেকেই পথটির নাম হয়ে যায় কয়লাঘাট স্ট্রীট । এই রাস্তায় পুরনো কেল্লার ধ্বংসাবশেষ কয়েকটি দেওয়াল ও স্তম্ভ ছিল । ১৯২০তে তা ভেঙে দেওয়া হয় ।

চার্চ লেন

চার্নক মারা যান ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে। সেন্ট জন্স্ চার্চ সংলগ্ন সমাধি ক্ষেত্রে চার্নকের সমাধি ছিল। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে সেন্ট জনস চার্চ সেন্ট অ্যানের নামে উৎসর্গিত হয়। অষ্টবাহু কোণাকৃতি ছিল গীর্জার চূড়া। ১৭৩৭ সালের প্রচণ্ড ঝড়ে এই গীর্জায় চূড়া ভেঙে পড়ে। এই চার্চের নাম থেকেই সন্নিহিত পথের নাম হয় চার্চ লেন।

পার্ক স্ট্রীট

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক স্যর এলিজা ইম্পে থাকতেন মিড্‌লটন রো-এর একটি বড়ো বাড়িতে, এই বাড়ির সীমানা ঘিরে ছিল একটা বড়ো পার্ক। এই পার্কে তখন হরিণ থাকত বলে নাম ছিল 'ডিয়ার পার্ক'। এই পার্কের নাম থেকেই পথটির নাম হয় পার্ক স্ট্রীট।

ফেয়ার্লি প্লেস (Fairlie Place)

মিঃ ফেয়ার্লি ছিলেন প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফেয়ার্লি ফার্গুসন অ্যাণ্ড কো (Fairly Fargusson and Co.) এর প্রধান অংশীদার। তাঁরই নাম অনুযায়ী এ রাস্তার নামকরণ হয়।

ফিয়ার্স লেন (Phear's Lane)

স্যর জন বুদ্ ফিয়ার ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক। তিনি যথার্থই ভারতের বন্ধু ছিলেন। কলকাতাবাসী তাঁকে ভালোবাসত তাঁর বহু কল্যাণকর কাজের জন্যে। এরই নাম অনুসারে গলির নাম হয় ফিয়ার্স লেন।

কলেজ স্ট্রীট

নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে – কলেজের নাম অনুসারেই এ পাড়ার নাম হয়েছে। তবে কোন্ কলেজ ? হিন্দু কলেজ আর মেডিক্যাল কলেজের জন্যে।

ব্রিটিশ ইন্‌ডিয়ান স্ট্রীট।

কলকাতার তখনকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এই রাস্তায় ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের নাম অনুসারেই রাস্তার নাম। আগে নাম ছিল 'রানা মোদ্দা গলি'। এইখানে অঞ্চলের দখল নিয়ে মানিকচাঁদ আর ইংরেজদের লড়াই হয়েছিল।

শোভাবাজার

শোভা বসাক এই অঞ্চলের সম্পন্ন জমিদার ছিলেন । তাঁর নাম অনুযায়ী এই অঞ্চলের নামকরণ হয় ।

শ্যামবাজার

সম্ভবত শোভা বসাকের আত্মীয় শ্যাম বসাকের নাম অনুযায়ী এই অঞ্চলের নাম হয় । কেউ কেউ বলেন শ্যামলাল রায়ের নাম থেকে এই নামকরণ, যে শ্যামলাল রায়ের নাম থেকে লালদীঘি এবং লাল বাজারের নাম হয় ।

শ্যামবাজারের নাম আগে ছিল চার্ল্‌স্ বাজার । নাম করেছিলেন হলওয়েল সাহেব ।

খিদিরপুর

১৭৭৫ সালে কর্নেল ওয়াটসন আর এ. ক্যাম্বেলের উপর দায়িত্ব পড়ে এ অঞ্চলে ডক গড়ে তোলবার । পরে ১৭৯৫ সালে প্রথম ডকগুলো গড়ে তোলেন মিঃ ওয়াডেল (Waddel) এর নামকণর হয় কর্নেল রবার্ট কিড্‌স্-এর (Colonel Robert Kyds) নাম থেকে । Kyds Street এর নামও এরই নাম থেকে । তিনি ছিলেন মিলিটারি সেক্রেটারি । বোটানিকাল গার্ডেন গড়ে তোলার কৃতিত্বও প্রধানত কিড্‌স্-এর । 'কিডের নগর' ইংরেজিগতে দাঁড়ালো Kidderpore.

হগমার্কেট (নিউমার্কেট)

কলকাতা কর্পোরেশন স্থাপিত হয় ১৮৬০ নাগাদ । V.H. Schalet প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন (১৮৬৩-৬৬) । তারপর চেয়ারম্যান হলেন স্টুয়ার্ট হগ (Stuart Hogg) তিনি ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৬ এই দশ বছর কলকাতার চেয়ারম্যান ছিলেন । কলকাতার তখনকার সবচেয়ে বড়ো বাজার হগমার্কেট তাঁরই নাম অনুসারে । পরে এই হগমার্কেটের নাম হয় নিউ মার্কেট ।

গোলদীঘি

গোলপাতার বনে ঘেরা ছিল জায়গাটা তাই এর নাম গোলদীঘি এই মতই প্রচলিত ছিল । কিন্তু সেমত বোধহয় অচল হল ।

মঞ্চ থেকে অবসর নেবার পর শিশিরকুমার ভাদুড়ি মশাই ৬নং কলেজস্ট্রীটে একটা বইয়ের দোকানে আসতেন । ওখানে আড্ডা জমত । পুরনো দিনের নানা কথা হত । গোলদীঘির নাম কী করে হল তা ওঁর মুখের কথাতেই বলা যাক;

'দীঘি তো আগে গোলই ছিল তাই গোলদীঘি নাম। ১৯২২-২৩ সনে মাটি ফেলে বুজিয়ে চৌকো করে ফেলেছে। ওখানে আমরা আড্ডা মেরেছি। আমরা কিং কিং খেলতুম।' চৌকোদীঘিকে যেন গোলদীঘি বলা হয় তাই নিয়ে জল্পনাকল্পনা চলছিল খুব। শিশিরকুমার ভাদুড়ির এই উক্তিতে মীমাংসার সূত্র পাওয়া গেল।

হেঁদো

কর্ণোয়ালিস স্কোয়ারের আটপৌরে নাম হেঁদুয়া বা হেঁদো। 'হ্রদ' থেকে এই নামের জন্ম বলে কেউ কেউ মনে করেন, কারণ দীঘিকে কেন্দ্র করেই তো নাম। ডঃ সুকুমার সেন বলেন হেঁদো মানে মজাপুকুর।

টেরিটি বাজার

'টেরিটি বাজারে তার সন্ধান পেনু। গোরা বোষ্টম বাবা নাম নিল বেণু'। – কিন্তু বাজারটার ঐনাম হল কেন? নাম হয়েছে Mr. Tirettaর নাম থেকে। Tiretta লোকমুখে হয়ে উঠেছে টেরিটি।

সার্কুলার রোডের খালকাটার পরিকল্পনা সর্বপ্রথম করেন এই টেরিটি সাহেব।

তিনি কলকাতার পথঘাট ও বাড়িঘরের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন।

ধর্মতলা স্ট্রীট

এই এলাকার ধর্মস্থান মসজিদ আর দরগা থেকেই নাকি এ রাস্তার নাম ধর্মতলা স্ট্রীট হয়েছে। কেউ আবার বলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের যে আড্ডা ছিল, তা থেকেই 'ধর্মতলা' নাম এসেছে।

আর-একটি মতও এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত। অনেকে মনে করেন ধর্মঠাকুরের নাম অনুসারেই এ রাস্তার এই নাম।

ফ্রিস্কুল স্ট্রীট

১৭৮০ সালেও এখানে বাঁশের জঙ্গল ছিল। ১৭৮৯ সালে এখানে সাহেবদের জন্যে একটি ফ্রি-স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুল থেকেই এই নাম।

এই রাস্তার ৩৯ নং বাড়িতে ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ইউলিয়ম থ্যাকারের জন্ম হয়।

সার্কুলার রোড

সার্কুলার রোডটি কলকাতার পূর্বপ্রান্ত বেষ্টন করে শ্যামবাজার থেকে চৌরঙ্গীর পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে। পূর্বপ্রান্ত বেষ্টন করে আছে বলে তার ঐ নাম। বর্গীর হাঙ্গামার সময় যে মারাঠা-ডিচ্ খোঁড়া হয়েছিল তা পরে বুঁজিয়ে দিয়ে ঐ পথ তৈরি হয়। এই রাস্তাই তখন সাহেবমেমদের সান্ধ্যভ্রমণের জায়গা ছিল। এই পথটির দেশী নাম ছিল 'বাহার-কা-সড়ক্' অর্থাৎ বা'র সড়ক। বর্তমানে আপার সার্কুলার রোডের নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, 'লোয়ার সার্কুলার রোডে'র নাম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড।

বৌবাজার ও বৈঠকখানা

লালবাজারের মোড় থেকে শুরু করে এই রাস্তা বরাবর পূর্বদিকে শিয়ালদার দিকে গিয়েছে। এই পথের দুধারে বড়ো বড়ো গাছ ছিল। এই পথের নাম ছিল Avenue to the Eastward। এই পথের ধারে শিয়ালদার কাছে ছিল বিখ্যাত একটি বটগাছ। এই বটগাছকে ঘিরে ছিল চাতাল। সেখানে নানাজায়গার ব্যবসায়ীদের বৈঠক বসত। তাই জায়গাটার নাম হল বৈঠক খানা। শোনা যায় জবচার্ণকও নাকি এই বটগাছের ছায়ায় বসে হুঁকো টানতেন। গাছটি নেই, নামটি রয়ে গেল।

বহু বাজারের প্রখ্যাত ধনী বিশ্বনাথ মতিলাল তাঁর এক পুত্রবধূকে একটি বাজার দান করল। এই বাজার 'বধূবাজার' নামে চিহ্নিত হয়। বধূবাজার বা বহুবাজার চলতি উচ্চারণে হল 'বৌ-বাজার'।

বাগবাজার স্ট্রীট

বাগাবাজার শুনে মনে হয় হয়তো বা জঙ্গলে বাঘের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল। না, মোটেই না। 'বাগ' মানে বাগান। এখানে পলাশীযুদ্ধের আগে পেরিন্‌স্ গার্ডেন – নামে একটা বাগান ছিল। এই পেরিন্‌স্ গার্ডেন (Perrin's Garden) এক সময় ইংরেজদের বেড়াবার জায়গা ছিল। এইখানে যে বাজার গড়ে উঠেছিল ঐ বাগানের নামেই তা চিহ্নিত হয়ে বাগাবাজার হল। সমস্ত অঞ্চলটাই ঐ নাম নিল।

জোড়াসাঁকো

বহুকাল আগে দুটি নালা গঙ্গা থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত এসে মিলিত হয়ে একটি নালায় পরিণত হয়ে লবণহ্রদের (Salt Water Lake) দিকে যেত। এই

দুটি নালার সংযোগ-স্থলে একটি জোড়াসাঁকো (সেতু) ছিল। এর থেকেই নাম হল জোড়াসাঁকো। সাঁকোটা রইল না, রয়ে গেল নামটা।

পান্তীর মাঠ

১৬ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে প্রকাণ্ড এক দোতলা বাড়িতে স্বদেশীযুগে অনেক অনুষ্ঠান হত। এই বাড়ির সামনেই একটি বড়ো খোলা মাঠ ছিল। সেই মাঠকে লোকে পান্তীর মাঠ চলত। এর মালিক ছিলেন রানাঘাটের জমিদার কৃষ্ণ পান্তী। প্রথম জীবনের অভাব-অনটনের সময় তিনি পান বিক্রি করতেন বলে লোকে তাঁকে 'পান্তী' বলত। তাঁর নাম থেকেই এই মাঠের নাম। পান্তী-মশাইয়ের আসল নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র পাল।

যদুবাবুর বাজার

ঐ নামে এখন যে অঞ্চলটি চিহ্নিত সেখানে একটা বড়ো বাগান ছিল। সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম জর্জ স্যর রবার্ট চেম্বার্স ছিলেন এই বাগানের মালিক। রানী রাসমণি চেম্বার্স সাহেবের এই বাগানটি কিনে নেন, এবং সেখানে বাজার বসিয়ে তা তাঁর দৌহিত্র যদুনাথ চৌধুরীকে দান করেন। এর থেকেই বাজারটি যদুবাবুর বাজার নামে চিহ্নিত হয়। ভুল করে একে 'জগুবাবুর বাজার' বলা হয়।

পামার বাজার

প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন জন পামার যাঁকে ইংরেজরা প্রিন্স অব্ মার্চেন্ট্স্ উপাধি দিয়েছিল। তাঁর ছোটো ছেলে ফ্রাঙ্ক্ পামার একটি বাজার বসিয়েছিলেন, তাঁর নাম থেকেই এর নাম হয় পামার বাজার। বাজার আর নেই, এখন আছে পামারবাজার রোড, এন্টালি অঞ্চলে মুন্সিবাজারের দক্ষিণে।

জোড়াবাগান

পাশাপাশি দুটো বাগানের নাম থেকে জায়গাটার এই নাম হয়েছে। বাগানটি ছিল বৈষ্ণবচরণ শেঠের। তিনি বৈষ্ণবদাস নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। এইখানে ১৯০১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে গড়ে ওঠে জোড়াবাগান স্কোয়ার। একটা মস্ত ঘিঞ্জি বস্তী উচ্ছেদ করে এই স্কোয়ারের পত্তন হয়। এই জোড়াবাগান স্কোয়ারের পশ্চিমে জোড়াবাগান ঘাট।

গ্রামনামে প্রকৃতি

শব্দ হিসেবে গ্রাম-নামগুলো এক আশ্চর্য সৃষ্টি, ঐ নামগুলোর মধ্যে পল্লীর মানুষের নানা বাসনা, নানা স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব নামগুলোকে বিশ্লেষণ করা যায়। এই পর্বে আমরা শুধু গ্রামনামে প্রকৃতি কীভাবে অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে তাই দেখ।

– এটা কী গ্রাম গো ?

– পলাশ গ্রাম।

পলাশ গ্রাম। পুষ্প-সঙ্গে গ্রামের নামটি মন কেড়ে নেয়। গাছপালা, ফুল-ফল, নদ-নদী, খাল-বিল-দীঘি, আকাবাতাস সব মিশে আছে গ্রাম নামগুলোতো।

সূর্য-চন্দ্র-তারা

সূর্যবাটী, আদিত্যপুর, চন্দ্রকোণা, চন্দ্রমণিপুর, তারাগ্রাম।

গাছপালা-ফল-ফুল

অর্জুনবনী, আমগাছি, কলাগাছি, তালডাঙা, জারুলিয়া, চাঁপাডাঙা, চালতিয়া (< চালতে), খাজুরা, <), ফুলগাছিয়া, ফুলুই, পাকুড়িয়া (< পাকুড়), নিমচক, পারুলডাঙা, জামতাড়া, হিঙ্গাপালি, হেলেঞ্চা, হিঞ্চি (< হিঞ্চে) শাখডাল (কুচবিহার), শাগপাড়া (মেদিনীপুর), চাঁপাহাটি, (২৪ পরগণা)।

শস্যাদি

আউশগ্রাম (বর্ধমান), আউসা (পশ্চিমদিনাজপুর), আম-গেড়্যা (মেদিনীপুর), আমনডি (পুরুলিয়া), কলাইমুণ্ডা (মেদিনীপুর), ধান-আড়া (পুরুলিয়া), ধনিয়াখালি (হুগলী), পোস্তগ্রাম (বর্ধমান), মসুর-ভাঙা (মুর্শিদাবাদ), মসুরিয়া (হুগলী), সরিষা (২৪ পরগণা)

পশুপাখি-সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ

কাকাদ্বীপ, কাউয়া, কোকিলপুর, কোকিলা (পঃ দিনাজপুর), খঞ্জনচক, (মেদিনীপুর), গণ্ডারপুকুর (হুগলী), পেঁচাআড়া (পুরুলিয়া), বাঘমারি (বাঁকুড়া), ভালুডুংরি (ভালু - ভাল্লুক), শিয়ালডাঙা, শিয়ালদা, হরিণঘাটা, কেউটিয়া (২৪ পরগণা), গোখুরপাল (মেদিনীপুর), ছুঁচাদা ((মেদিনীপুর), টিকটিটপাড়া (মুর্শিদাবাদ), কালনাগিন (পঃ দিনাজপুর) ফড়িং গাছ (নদীয়া), ভীমরুলিয়া (মেদিনীপুর) ময়াল (হুগলী) মাকড়কোল (বাঁকুড়া) ।

গ্রাম নামগুলো প্রায়ই সমাসবদ্ধ অর্থাৎ দুটি পদে ঘটিত । এতক্ষণ প্রথম পদে প্রকৃতি-অনুষঙ্গের কথা বলা হল । এবারে কিছু পর-পদের উদাহরণ দেওয়া যাক যেখানে প্রকৃতি মিশে আছে ।

ঘাট, ঘাটি

গোঘাট, গাইঘাটা, হরিণঘাটা, ঘোড়াঘাট, পোড়ামাটি

ঝরনা

আমঝরনা, কালিঝরনা

ঝোর

(ঝোরও ঝরণাবাচক)

কাঁকড়াঝোর, সোনাঝোর বা সোনঝোর ।

ডোবা, ডুবি

বাঘডোবা, বাঘডুবি, শুকডুবি ।

দহ, দা, দা

('হ্রদ' থেকে 'হদ', বর্ণবিপর্যয়ে দহ, দহ থেকে, দা, দা)

মাকড়দহ, খড়দহ, বাগদা, শিয়ালদা ।

দীঘি

শুক্লাদীঘি, বিনোদদীঘি।

পুকুর

তালপুকুর, বাণীপুকুর, চন্ননপুকুর।

বন

জামবন, জানবনী, নলবনা, শালবনী

সাগর > সায়র

তালসাগর, কৃষ্ণসাগর

অনেক সময় এক শব্দে নাম মনে হলেও দ্বিতীয় পদটি থাকে প্রত্যয়ের ছদ্মবেশে যেমন জীয়ড় < জীববট, শিয়ড় < শিরবট, বেতড় < বেত্রবট, পাঁচড়া < পঞ্চবট ইত্যাদি। গ্রামনামে বটের ছড়াছড়ি। এই 'বট'ই ধ্বনি পরিবর্তনে 'ড়' এর রূপ নিয়েছে অনেকক্ষেত্রে।

'শহর-নগরের নামেও ব্যাপকভাবে এই প্রকৃতির পরশ আছে। আসলে গ্রামই তো শহর হয়ে উঠেছে। কিন্তু পুরনো নাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রয়ে গিয়েছে। কলকাতার অনেক জায়গার নামেও যে উদ্ভিদ তার আসন করে নিয়েছে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা হয়েছে আগের পর্বে। অনেক সময় শহরগুলোর নামে যে তরুসঙ্গ আছে তা বোঝাই যায় না, যেমন আসানসোল। ওখানে আগে 'অসন' গাছ ছিল প্রচুর তার থেকেই এই নাম। 'সোল' কথাটি জন-বহুলতা বোঝায়।

ওদেশের বিখ্যাত শহরের নামেও প্রকৃতি-সঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। যেমন লণ্ডন (LONDON)। এটি এসেছে LONDO শব্দ থেকে, যার মান বাতাস, এটি আদি পল্লীবাসীদের শব্দ।

কেম্ব্রিজ শব্দের মধ্যে আছে পুরানো এক গ্রামের কোনো নদীর উপর তৈরি সাঁকোর স্মৃতি।

Oxford শহর তো স্পষ্টই বলছে Ox আর ford নিয়ে সে তৈরি। Ford মানে নদীর এমন জায়গা যা হেঁটে পার হওয়া যায়। আর Ox এর অর্থ তো বলবারই দরকার নেই।

অনুবাদ-শব্দ

ইংরেজির বহু শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা বাগ্‌বিধি (idiom) কে আমরা বাংলায় আপন করে নিয়েছি তর্জমা বা অনুবাদের মধ্যে দিয়ে । এই রকম কিছু শব্দ এই পর্বের আলোচ্য ।

সুবর্ণসুযোগ

'এমন সুবর্ণসুযোগ হেলায় হারাস নে' । এই সুবর্ণসুযোগ কথাটি আমাদের বাগ্বিধির নয়, এটি আমরা পেয়েছি ইংরেজি golden opportunity কথাটির হুবহু তর্জমা করে ।

ঝটিকা সফর

'ইউরোপে **ঝটিকাসফর** সেরে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে এসেছেন ।'

এই ঝটকা-সফর বোঝাচ্ছে বহু জায়গায় তাঁকে অল্প সময়ে যেতে হয়েছে । এই শব্দটির জন্যে আমাদের ঋণ 'hurricane tour" কথাটির কাছে ।

গণমাধ্যম

রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদিকে আমরা বলি গণমাধ্যম । এই শব্দটি আমরা পেয়েছি সংবাদ mass media কথাটর সরাসরি তর্জমা । mass = গণ, media (meadium এর বহুবচন) = মাধ্যম সমূহ ।

কালোবাজার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু নিত্যব্যবহার্য জিনিস বাজার থেকে উধাও হত । আসলে এগুলো ব্যবসায়ীরা খোলাবাজারে না বেচে লুকিয়ে রাখত বেশি দামে বেচবার জন্যে । এই লুকনো বাজারকে যে ইংরেজিতে black market বলা হতো, তার থেকেই 'কালোবাজার' । 'চোরা বাজার' কথাটাও একই অর্থে চলত অনেক সময়ে ।

কালোটাকা

যে টাকার হিসেব গোপন রাখা হয় আয়কর ইত্যাদি এড়ানোর জন্যে তাকেই কালোটাকা বলি আমরা। এসেছে Black Money থেকে।

নিষ্প্রদীপ, অপ্রদীপ

যুদ্ধের সময় বোমা পড়ার ভয়ে আলো নিভিয়ে দেওয়া হত বা আলোয় মুখোশ পরিয়ে রাখা হত শহরটার ভূগোল যাতে বোমারুরা ওপর থেকে ভালো করে না বুঝতে পারে তার জন্যে। একে Blackout বলা হত। Blackout থেকে আমরা নিষ্প্রদীপ বা অপ্রদীপ কথাটি পেয়েছি। রাজশেখর বসু এই দুটি শব্দ সমর্থন করেছিলেন।

স্বজনপোষণ

এই শব্দটা পেয়েছি "nepotism" এর তর্জমায়। nepotism শব্দটা এসেছে লাতিন 'nepos' থেকে। nepos মানে 'নাতি'। নাতি এখানে স্বজনের প্রতীক। Pope (চার্চের ধর্মাধ্যক্ষ) স্বজনদের প্রশ্রয় দিলে এ কথাটা তাঁর আচরণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হত, তারপর, সরকারের প্রধান ব্যক্তিরা স্বজনদের পৃষ্ঠপোষণ করলে তাদের আচরণ সম্বন্ধে এ কথাটা প্রচলিত হল।

গণভোট

'গণভোট' শব্দের প্রেরণা সম্ভবত plebisite (= direct vote of the people) লাতিন Plebs = গণ বা নীচুতলায় মানুষ, বঞ্চিত মানুষ। scitum = আদেশ বা বিধান (decree). প্রাচীন রোমে নাগরিকদের অধিকার দাবিতে গণভোটের ব্যবস্থ ছিল।

মধুচন্দ্রিমা বা মধুচন্দ্রিকা

'মধুচন্দ্রিমা' কথাটির honeymoon এর বঙ্গানুবাদ। Honeymoon মানে বিয়ের পরপরই ভ্রমণে বেরনো। Honeymoon কথাটির তাৎপর্য পূর্ণচন্দ্র আকাশে থাকতে থাকতে ভ্রমণ সেরে নাও। অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র ক্ষণস্থায়ী, বিয়ের পর আনন্দের সময়টুকুও তেমনি। তারপরই সংসারের নানা জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে হবে।

রম্যরচনা

ফরাসী belle lettres কথাটির অনুবাদ। Belle = সুন্দর সরস। lettres = সাহিত্যক রচনা।

এইরকম মাগ্‌গীভাতা, (< dearness allowance), ভর্তুকি (subside) বাস্তুহারা (< displaced person), পুনরাবাসন (< rehabilitation), মধ্যবিত্ত (< middle class), নিম্নমধ্যবিত্ত (< lower middle class) উচ্চমধ্যবিত্ত (< upper middle class) বহুতল গৃহ (< multistoried building), ইত্যাদি বহু শব্দ আমাদের ভাষাভাণ্ডারে জমা হয়েছে।

কলমবন্ধু

যাকে চিনি না, কোনোদিন চোখেও দেখিনি, তার সঙ্গেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে চিঠির মধ্যে দিয়ে। এইরকম বন্ধু কে আমরা বলি কলম বন্ধু। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই penfriend থেকেই এই মিষ্টি শব্দটি আমরা পেয়েছি।

কিছু ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ

লোকনিরুক্তি পর্বে আমরা শেষ তিনটি উদাহরণে (Bungalow, attor, godown) দেখেছি ভারতীয় বাংলা, আতর আর গুদাম ইংরেজিতে কী রূপ নিয়েছে। এইপর্বে বিশেষকরে আরও কিছু ভারতীয় শব্দের উদাহরণ দেওয়া যাকে যেগুলো কথ্য ইংরেজিতে গৃহীত হয়েছে। থোকাও মূল উচ্চারণ বজায় আছে, কোথাও বা সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে, কোথাও বা পরিবর্তনের বহরটা একটু বেশি।

Pooja (পূজা), Pandit (পণ্ডিত), Sati (সতী), Veda (বেদ), Yoga (যোগ), Pacca (পাক্কা), Lathi (লাঠি),. nantch (নাচ), pie (পাই = মুদ্রা), dewali (দেওয়ালী), Dinghee (ডিঙি), Fakeer Fakir, Faquir (কমির), হুঁকা (Hookah) Jumoon (জামুন-হিশী), Dhurmsalla (ধরমশালা), Muslin (মসলিন), Ghat Ghaut (ঘাট)।

এগুলোকে নিছক কথ্য বলা যায় না, সাহিত্যেও এসব শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ইংরেজিতে এমন কিছু শব্দ আছে যাকে ভারতীয় বলে বোঝা শক্ত।

যেমন jute (পাট) শব্দটি । 'জুট' বলে পৃথক শব্দ অবশ্য বাংলায় বা সংস্কৃতে নেই – সহচর শব্দেই তা পাওয়া যায় – জটাজূট । তবে কিছু আঞ্চলিক ভাষায় পাট বোঝাতে 'জোট' কথাটি মেলে ।

এসব শব্দের উচ্চারণে পরিবর্তন তেমন ঘাটেনি, যেমন ঘটেছে ভারতীয় নদী বা স্থান নামে । যেমন–

যমুনা হয়েছে Jumna গঙ্গা হয়েছে Ganges কলকাতা হয়েছে Calcutta, মুম্বা হয়েছে Bombay, লক্ষ্ণৌ হয়েছে Lucknow, মথুরা হয়েছে Muttra, বর্ধমান হয়েছে Burdwan ।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই স্টেশনের ইংরেজি ও বাংলা নাম মিলিয়ে দেখলেই উচ্চারণের তারতম্য ধরা পড়বে ।

বারান্দা

আমাদের 'বারন্দা' ইংরেজিতে হয়েছে Veranda বা Verandah (আরও নানা বানানে পাওয়া যায়)

...... 'that in which the captain lives has a Veranda' — Bocarro

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে বারান্দাটা আমরা হয় তো ফার্সী থেকে পেয়েছি । মূল ফার্সী শব্দটি সম্ভবত 'বর-আমদহ্' – আক্ষরিক অর্থে যা সামনে বেরিয়ে আসে (projecting, coming forward).

ফরাসী বহু কথায় baranda বানান গৃহীত হয়েছে – 'un baranda'

Pandal

আমরা বলি 'পূজো প্যাণ্ডেল' । 'মণ্ডপ' অর্থে শব্দটির প্রয়োগ । শব্দটি মূলত তামিল বহুবানানে এই শব্দটি পাওয়া যায় Pendal, Pendaul, Pandaul ইত্যাদি ।

"There I had assembled in the same **pandaul** — Forbes

"Pandauls" were erected opposite the two principal fords on the river — Dr. M, Kenzie.

Pepper

'মরিচ' অর্থে কথাটি ইংরেজিতে গিয়েছে আমাদেরই শব্দ থেকে । সংস্কৃতে পিপ্‌পলী মানে লম্বা মরিচ ।

Tom-tom

টমটম একরকমের ঢাক। এই শব্দটি হুবহু ইংরেজিতে গিয়েছে।

১৬৯৩এর একটি সংবাদ ঘোষণা ঃ

It is ordered that tomorrow morning the chonltry justices do cause the Tom Tom to be beat through all the streets of the Balck Town —'

Choultry শব্দটি দক্ষিণ ভারতীয়। এর অর্থ চৌমাথা। এ শব্দটিও ইংরেজি গৃহীত হয়েছে।

['Black town' কথাটি পুরানো কলকাতার দিশী পাড়া বোঝাচ্ছে]

Gherao

সম্প্রতি ঘোরাও কথাটি বাংলা সংবাদপত্রের মারফৎ ইংরেজিতে গৃহীত হয়েছে।

'The police rescured the Principal from the gherao'

'gherao' ক্রিয়াপদেও চলছে –

And then he was gherao(e)d by the employees.

Juggernanut

আমাদের 'জগন্নাথ' ইংরেজিতে হয়েছে 'Juggernaut'. Under the wheel of Juggernaut ইংরেজিতে idiom হিসেবেও গৃহীত হয়েছে।

This is a festival of purification. Throw the demons of our heart under the wheels of juggernaut.

স্বেচ্ছাশব্দ

স্বেচ্ছাশব্দ নামে আমরা সেই সব শব্দকে চিহ্নিত করছি যা ধ্বনিসাদৃশ্যে নূতন সৃষ্টি, যা প্রচলিত অর্থ থেকে পৃথক কোন অর্থে যা ব্যবহৃত অথবা প্রচলিত শব্দকে ঈষৎ পরিবর্তিত কারে নেওয়া।

জালায়ন

জানালা আর বাতায়ন শব্দ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত কাব্যে জানালা বোঝাতে 'জালক', 'জালমুখ' এবং শুধু 'জাল' শব্দের প্রয়োগ আছে। হেমচন্দ্র 'জালাক্ষ' শব্দটি রচনা করেছেন।

দাঙ্গামা

'দাঙগ্‌ামা বেড়ে উঠেছে' – খবরের কাগজে এই 'দাঙ্‌গামা' শব্দটি দেখা গিয়েছে– যা দাঙ্‌গা আর হাঙ্‌গামা মিলিয়ে তৈরি হাঁসজারু শব্দ।

দুষ্কৃতী

আগে চলত 'দুষ্কৃতকারী' শব্দ। দুষ্কৃত (কুকর্ম), কৃ + ণিন্ = দুষ্কৃতকারী (অর্থাৎ দুষ্কর্ম করে যে) এখন চলছে দুষ্কৃতী শব্দ। যদিও 'দুষ্কৃতী' ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। দুষ্কৃত + ইন্ (আছে যার অর্থে) = দুষ্কৃতিন্ > দুষ্কৃতী। 'করে যে' অর্থটাকে বদলে নিয়ে 'আছে যার' অর্থে আগেকার শব্দটিকে ছোটো করে নেওয়া ব্যাকরণের দিক থেকে সুকৃতি কিনা তা বলা শক্ত।

অবলীলায়

আগে চলত অবলীলাক্রমে। 'অবলীলা' মানে 'ছোটোখাটো বা সহজ খেলা। অবলীলাক্রমে = খেলাচ্ছলে। অবলীলাক্রমে বিদ্যাসাগর দামোদর অতিক্রম করিলেন। অবলীলাক্রমে শব্দটি ক্রিয়াবিশেষণ (Adverb)। অবলীলা = বিশেষ্য তার সঙ্গে 'য়' বিভক্তি যোগ করে তাকে ক্রিয়াবিশেষণ না করাই ভালো। তবু 'অবলীলা' এখন অবলীলাক্রমে চলছে।

অনুপুঙ্খ

'পুঙ্খানুপুঙ্খ' শব্দের জায়গায় এখন চলছে 'অনুপুঙ্খ'। পুঙ্খ মানে পালক। বাণের পালকের সঙ্গে আর একটি পালকের সূক্ষ্ম সংযোজন এককথা আক্ষরিক অর্থ, ব্যঞ্জনায় তা বোঝায় – অতিসূক্ষ্ম। 'পুঙ্খ' থাকলেই অনু (পরবর্তী) থাকতে পারে, আগে 'পুঙ্খ' ছেঁটে দিলে পালক কাটা পাখির দশা হবে শব্দটার, কিন্তু শব্দটি এখন বহু প্রচলিত।

প্রেক্ষিত

'পরিপ্রেক্ষিত শব্দের বদলে এখন শুধু 'প্রেক্ষিত' চলছে কোনো কোনো সংবাদপত্রে ঃ 'ঘটনার প্রেক্ষিতে।' পরিপ্রেক্ষা = পর্যালোচনা। প্রেক্ষা = লোচনা, অর্থাৎ শুধু দর্শন মানেটা দাঁড়ায় ঘটনাদর্শন। ব্যাকরণগত ভুল হয় না, কিন্তু পরিপ্রেক্ষার মধ্যে যে দর্শন ছাড়াও তত্ত্বানুসন্ধানের অর্থ ছিল তা আর রইল না।

আনেকো

সত্যেন্দ্রনাথ এ শব্দটি ব্যবহার করছেন 'ভোরাই' কবিতায়। একটি স্তবকে আছে 'আনকো আলোয়' -- ছন্দের খাতিরে হয় তো আনকোরা' শব্দের জায়গায় 'আনকো' করেছেন ঐ অর্থ প্রকাশ করার জন্যে। যদি সংপেক্ষপণ না হয় তাহলে এটি কি কোনো আঞ্চালিক শব্দ ? কিন্তু আঞ্চলিক অভিধানে ঈপ্সিত অর্থে শব্দটি দেখা যায় না।

বারুণী

'বারুণী' মানে নক্ষত্রবিশেষ, পশ্চিম দিক বা মদিরা। বরুণের পত্নী 'বরুণানী', বারুণী নয়। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বরুণপত্নী হিসেবে শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গে ঃ

টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে ;
গর্জিলা বারীশ রোষে। যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ বনে প্রবাল আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিল,'

– কী সুন্দর প্রয়োগ, ছন্দোবন্ধনে এমন চমৎকার মানিয়েছে শব্দটি যে অপপ্রয়োগ তা কেউ বলবেন না, বরং অভিধান রচয়িতাকে বলবে ঠাঁই দাও শব্দটাকে।

প্রদোষ

'দোষা মানে রাত্রি। 'প্রদোষ' মানে যা 'দোষার' (রাত্রির) অব্যবহিত পূর্ববর্তী, অর্থাৎ সন্ধ্যা বা রজনীমুখ। রবীন্দ্রনাথ প্রদোষ শব্দটি উষা অর্থে ব্যবহার

করেছেন। সম্ভবত উনি এই অর্থ করেছেন বহুব্রীহিসমাসের আশ্রয় নিয়ে : প্রগত (পূর্ববর্তী) দোষা যার, উষার পূর্ববর্তী হচ্ছে রাত্রি। সেদিক দিয়ে এ অর্থ অসমীচীন নয়।

সংস্কার ও শব্দ

নবকুমার সম্বন্ধে যাত্রীরা সিদ্ধান্ত করেছিল, 'তাহাকে শিয়ালে খাইয়াছে'। বাঘ বোঝাতে তারা শিয়াল অর্থ ব্যবহার করেছিল। এর পিছনে কুসংস্কার হল – বাঘ উচ্চারণ করলে বাঘের পেটেই যেতে হবে। অবশ্য বাঘ বোঝাতে বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের নাম করলে সে ভয় আর থাকত না। রাতে 'সাপ' বলা চলবে না, বলতে হবে লতা, তা নাহলেই সর্পদংশনের সম্ভবনা! অবশ্য 'লতা' না বলে 'আস্তিক' বলা চলবে।

যদি বলা যায় 'ওর বসন্ত হয়েছে' তাহলে রোগীকে বাঁচানো মুশকিল হবে। বলতে হবে ওর মায়ের দয়া হয়েছে। 'চাল নাই' বলা চলবে না। বলতে হবে 'চাল বাড়ন্ত'। 'নাই' কথাটা অলুক্ষুণে। তেমনি 'যাই' না বলে বলতে হবে 'আসি'।

ছেলে হয়ে বাঁচে না যে মায়ের সে ছেলের নাম রাখবে মেথরা, গুয়ে, নিমাই, তিতুরাম বা ক্যাঙ্লা – যাতে যম তাকে না ছোঁয়। কেনারাম বেচারাম মানে নিজের ছেলেকে অন্যের নামে বেনামী করে রাখা। পাঁচকড়ি, তিনকড়ি মানে পাঁচকড়ি বা তিনকড়ি দিয়ে যাকে যমের কাছ থেকে কেনা হয়েছে, যমের দাবি আর সে-সব ছেলেদের উপর নেই।

"শ্বশুরঠাকুরের তলায়, ভাশুরঠাকুর দিয়ে আয়।" –

শ্বশুর আর ভাশুরের নাম করতে পারে না বধূ, তার শ্বশুরের নাম 'তুলসী'। আর ভাশুরের নাম প্রদীপ। তাই 'তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে আয়' না বলে সে 'শ্বশুরঠাকুর তলায় ভাশুরঠাকুর দিয়ে আয়' বলে।

রাতে চোরকে চোর বলতে নেই, বলতে হবে মানুষ। বিষ্টু ধেড়েসি যখন বলে 'মানুষ এয়েছিল, গো,' তখন বিষ্টু যে 'চোর এসেছিল' বলতে চায় পল্লীতে তা সবাই বোঝে।

'রেতের বেলা তেতুঁল তলা দিয়ে যেও না গো, তেনারা সব নামেন'। এখানে 'তেনারা' বলতে অপদেবতা বোঝাচ্ছে। 'ভূত' উচ্চারণ করতে নেই।

অনেক গাঁয়ের আসল নাম কি তা ধরাই যাবে না, কারণ সেই গাঁ যদি অপয়া হয় কেউই তার নাম করবে না, শোনা যায়, হুগলী জেলায় 'বেলমুড়ি' গ্রামটা না কি ছিল অপয়া। কেউ নাম করত ন, করত অন্য শব্দ দিয়ে। বলত 'শ্রীফল চালভাজা'। শ্রীফল = বেল, চালভাজা = মুড়ি। মিলিত আবেদনে ঐ নামের স্টেশনটির নাম বদলে রাখা হয়েছিল 'মাঝের গ্রাম'।

শেষ কথা

শব্দগল্পের আসর তো শেষ হল।

ভুল বললাম। এ আসর তো কখনও শেষ হবার নয়। একটা আসর আর-একটা আসরকে ডেকে আনবে। কথা নিয়ে যতটুকু কথকতা করা গেল তা কিছুই নয়। আরও কত রকমের ভাবভাবনা মনে উঁকি দিতে পারে শব্দকে কেন্দ্র করে। আর তাই দিয়েই তো আবার নতুন আসর বসাবার দরকার হবে। আর সে আসর যেখানেই বসুক না কেন, ছোটোবড়ো সকলেরই ভিড় জমুক সেখানে।

ঋষিরা ছোট্ট একটি মন্ত্র দিয়েছেন আমাদের – 'শং শব্দৈঃ'। তাঁরা বলতে চেয়েছেন শব্দ নিয়েই আমাদের সংসার। সে সংসারে মঙ্গল বয়ে আনুক শব্দ আর আমাদের শব্দচেতনা ॥

নির্দেশিকা

ক. আলোচিত শব্দ

খ. কলকাতা সম্পর্কিত স্থান বা রাস্তার নাম

শব্দের উৎস বা জন্মকথা সত্যিই বিস্ময়কর। 'শব্দ যখন গল্প বলে' সেই শব্দ-গল্প নিয়েই লেখা। শব্দ তো সকলেরই। তাই মূলত ছোটোদের লেখা হলেও ছোটোয় বড়োয় বইটা নিয়ে কাড়াকাড়ি হতেই পারে। যে-সব শব্দ আমরা অহরহ ব্যবহার করি অথচ খেয়াল করি না তা কী করে এল, সেইসব শব্দ নিয়েই বইটি পরিকল্পিত। সেইসঙ্গে বইটিতে আছে নানা ধরনের শব্দ-চিন্তা। যাকে বলতে ইচ্ছে হয় শব্দ কৌতুকী। বইটিকে যদি বলি ভাষা রহস্যে প্রবেশ করার একটি সোপান তাহলে তা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। শব্দজিজ্ঞাসার সঙ্গে লেখকের রসবোধ সর্বত্র সঞ্চারিত।

কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তির সময় বইটি প্রকাশিত হচ্ছে বলে 'কলকাতার স্থান নাম' পর্বটি একটি সময়োপযোগী সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী জ্যোতিভূষণ চাকী ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র। 'বহুভাষাবিদ' বললে এঁর সঠিক পরিচয়টি ফুটে ওঠে না, বরং 'ভাষারসরসিক' বললে কিছুটা কাছাকাছি যাওয়া হয়। পাণ্ডিত্যকে গোপন করে সবার সঙ্গে আনন্দরসে মিলিত হওয়াই বোধহয় এঁর বিশিষ্টতা। সংস্কৃত, ফারসী, পালি, হিন্দী, ফরাসী ইত্যাদি ভাষায় কিছু কিছু দুর্লভ সম্পদ তিনি বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়েছেন। ছোটদের জন্য ছড়া, গল্প, নাটক ও নিবন্ধ রচনাতে ইনি সিদ্ধহস্ত।

সম্পাদক, সংকলক ও গীতিকার হিসেবেও ইনি সুপরিচিত।

প্রচ্ছদ : সৌমেন মুখার্জী

মূল্য : ২৫ টাকা

বেস্টবুক্স্

১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ ISBN : 81-85252-27-0